মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুক্তি

১৬ ডিসেম্বর

বিজয়ের ৪৯ বছর

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে
শহীদের প্রতি আমাদের বিনম্র
শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয় দিবস। বিজয়ের ৪৯ বছর পূর্ণ হলো আজ। মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে একটি অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক অভিনন্দন।

ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্মের শততম বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সরকার এ সালকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করেছে এবং দেশজুড়ে বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের ওপর বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বিজয় দিবসের মর্যাদাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, আরও তাৎপর্যময় করে তুলেছে। সরকারের এ মহতি উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের মুক্তির সংগ্রাম ও একাত্তর সালের ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথ বেয়ে এসেছে বাঙালির বিজয়। সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালেই বাঙালির ওপর প্রথম আঘাত এসেছিল। রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার ঘোষণা দিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকেরা। ১৯৫২ সালে বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রাঙিয়ে বাংলার বীর সন্তানেরা মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধিকারের চেতনার যে স্ফূরণ ঘটেছিল, কালক্রমে তা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশ নিতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

- পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরস্ত্র নিরপরাধ ঘুমন্ত বাঙালির ওপর। বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল তারা। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে সেই রাতেই তারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। তবে তার আগেই তিনি বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা শুরুর বার্তা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেই ঘোষণায় তিনি বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে বীর বাঙালি। দীর্ঘ ৯ মাস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র-বাংলাদেশের। লাল-সবুজ পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে বিজয়ী বাঙালি। সেই পতাকা উঁচিয়ে প্রগতির পথে চলেছে বাঙালির অভিযাত্রা।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আমাদের সকলের অঙ্গিকার হোক; জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সকল দ্বিধা বিভক্তি ভুলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাঙলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া। তবেই মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে।

আমি মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দেশব্যাপী সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি)

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয় দিবস। বিজয়ের ৪৯ বছর পূর্ণ হলো আজ। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্য-বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় দিন। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূ খন্ডের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার এক চিরস্মরণীয় দিন। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্মের শততম বছর পূর্তি উপলক্ষে সরকার এ সালকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করেছে এবং দেশজুড়ে বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের ওপর বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বিজয় দিবসের মর্যাদাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, আরও তাৎপর্যময় করে তুলেছে।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের মুক্তির সংগ্রাম ও একাত্তর সালের ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথ বেয়ে এসেছে বাঙালির বিজয়। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশ নিতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা শুরুর বার্তা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেই ঘোষণায় তিনি বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে বীর বাঙালি। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র-বাংলাদেশের। লাল-সবুজ পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে বিজয়ী বাঙালি। সেই পতাকা উঁচিয়ে প্রগতির পথে চলেছে বাঙালির অভিযাত্রা।

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিয়োগ করেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের এক রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত। স্বপ্নের পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, আধুনিক সড়ক ব্যবস্থাপনা, জলপথে আধুনিক সাবমেরিন, বিশাল সমুদ্রসীমা জয়, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ স্থাপনসহ উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার প্রতিফলন ঘটেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বস্ত্র ও পাট খাতের উন্নয়নের ধারাকেও গতিশীল করেছে। তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও তাঁতিদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাধ্যমে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঢাকার অদূরে আধুনিক 'তাঁতপল্লি' স্থাপন করা হচ্ছে; বস্ত্র শিল্পের সোনালী ঐতিহ্য 'ঢাকাই মসলিন' পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে তাঁত বোর্ড সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে এবং দেশব্যাপী তাঁতশিল্পী ও তাঁতি উদ্যোক্তাদের মধ্যে চলতি মূলধন হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু করা হয়েছে।

পরিশেষে, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। পাশাপাশি বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিভিন্ন স্তরের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ম্যাগাজিন প্রকাশে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(লোকমান হোসেন মিয়া)

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক একটি অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হচ্ছে। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সমন্বয় রেখে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মানুষের ৫টি মৌলিক চাহিদা তথা-অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মধ্যে বস্ত্রের স্থান দ্বিতীয়। দেশের বস্ত্রের চাহিদা-যোগানের সাথে জড়িত রয়েছে দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী। স্মরণাতীত কাল থেকে তাঁতে কাপড় বুনে দেশের বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করছে এ দেশের তাঁতি সম্প্রদায়। বাংলার উৎপাদিত মসলিন ছিল এক সময় বিশ্ব সমাদৃত। আবহমান কাল থেকে এ দেশে তাঁত, তাঁতি এবং তাঁতের কাপড়ের রয়েছে সোনালী ঐতিহ্য। যা বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে উৎপাদিত কাপড় যেখানে বিশ্ব নন্দিত, যাদের শ্রম আর ঘামে দেশের অর্থনীতি চালিত, যাদের নিপুণ কারুকার্যে শোভিত দেশের সংস্কৃতি, যাদের তৈরি ভূষণে পরিচিত বাঙ্গালী তারাই আমাদের চিরচেনা তাঁত শিল্পী।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রথম লগ্নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবিকার সুযোগ করে দেয়ার প্রথম পদক্ষেপে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের তাঁতি সম্প্রদায়ের বিষয়টি অতি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করেছিলেন বলেই সে সময় তিনি সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে সুতা, রং ও রসায়ন প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব ও নিঃস্ব তাঁত শিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাঁদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) ওপর প্রদত্ত গুরুত্বানুসারে ১৯৭৭ সালের ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড গঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রহিত করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড পুনর্গঠিত হয়।

দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র-বাংলাদেশের। লাল-সবুজ পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে বিজয়ী বাঙালি। সেই পতাকা উঁচিয়ে প্রগতির পথে চলেছে বাঙালির অভিযাত্রা।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দীর্ঘ সময় পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রান্তিক তাঁতিদের পুজি সংকট নিরসন, মহাজনের কবল থেকে তাঁতিদের মুক্তি, তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নারীর শ্রম কাজে লাগানোর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, তাঁতিদের জন্য শুল্কমুক্তভাবে সুতা রং ও রাসায়নিক আমদানির সুযোগ প্রদান, বিটিএমসি মিলে উৎপাদিত সুতা মিল রেটে মিল গেট থেকে তাঁতিদের সরাসরি ক্রয়ের ব্যবস্থাসহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন এবং মসলিনের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দেন।

আসুন, আর থেমে থাকার সুযোগ নেই। সময় এসেছে এগোবার, সুযোগ এসেছে মেধা আর মননকে কাজে লাগাবার, সময় এসেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুগের সাথে পথ চলার, উন্নয়নের মহিসোপানে নারী-পুরুষ মিলে দাঁড়াবার। আমরা যে যেখানে আছি সকলে মিলে মুজিবের সোনার বাংলা গড়ার শপথ নিই।

পরিশেষে, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ শাহ আলম)

বঙ্গবন্ধু তাঁতি ও তাঁত শিল্পকে গভীরভাবে ভালবাসতেন

বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লেখা চিঠি:

'শ্রদ্ধেয় প্রীতি রানী দাশ
আমার আদাব গ্রহণ করবেন। তাঁত শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ আপনার দেয়া উপহার খানা জেনারেল ওসমানী সাহেবের মারফতে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। শিল্প জগতে তাঁত শিল্প এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের উন্নত মানের তাঁত শিল্প একটি গৌরবের বিষয়। দেশের ভাঙ্গা অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নে আপনাদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। সেহেতু আমাদের তাঁত শিল্পের ক্রমবিকাশ এবং বিশ্বের হস্ত শিল্পাঙ্গনে এর সুপ্রতিষ্ঠিত স্থান আমার একান্ত কাম্য। সরকার এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাবে। দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনাদের প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতি
শেখ মুজিব
২১/১১/১৯৭২

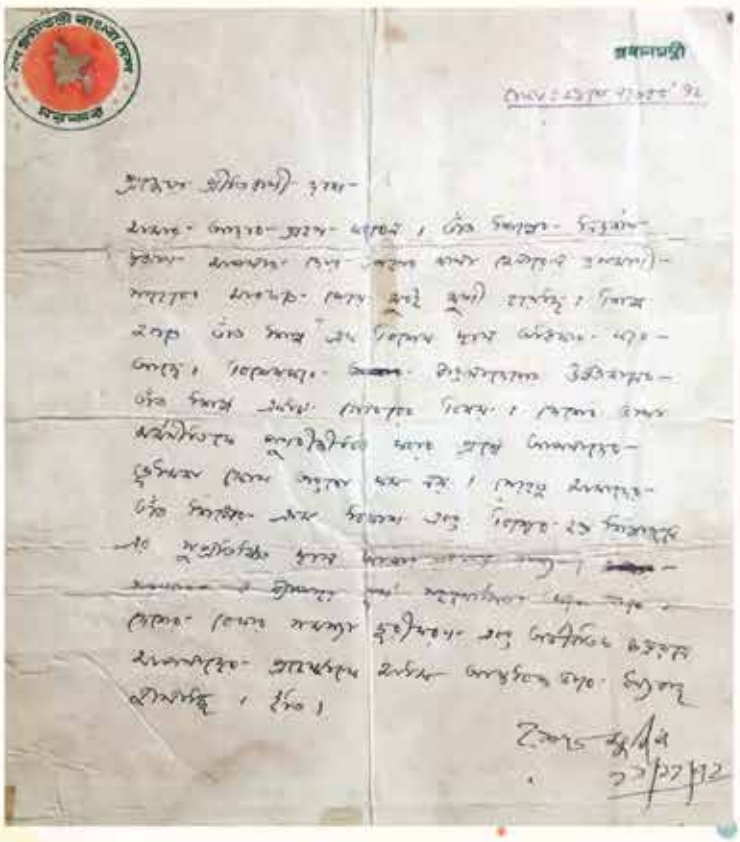

আহবায়কের কথা

পৃথিবীর সব স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা দিবস থাকলেও বিজয় দিবস থাকে না। বাংলাদেশ এই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী দেশ, যেটি ২৪ বছরের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের পর রণাঙ্গনে শত্রুকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেছে।

এ বছরটা আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুজিববর্ষ, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী। বাংলাদেশ তীত বোর্ড এই মুজিববর্ষকে সামনে রেখে বছরব্যাপী অনেক কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। কিন্তু কথায় আছে "Man proposes but God disposes". বৈশ্বিক মহামারী 'করোনা'র কারণে আমরা আমাদের কর্মপরিকল্পনার কারণে আমরা আমাদের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারিনি। তার ফলশ্রুতিতে আমরা ভিন্ন আঙ্গিকে এই বছরকে উদযাপন করছি। বাংলাদেশ তীত বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয়, জনাব মোঃ শাহ আলম, একটি অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশের নির্দেশনা দেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যুগপোযোগী এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের এক সুন্দর সমন্বয়। আমরা এই প্রস্তাবনার সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আনন্দিত।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। যেসব কীর্তিমান মানুষের আত্মত্যাগে এই বিজয় সম্ভব হয়েছিল, বিজয়ের দিনে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এ বিজয়কে অনিবার্য করে তুলেছিলেন, তাঁদের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন। আমাদের স্বাধীনতার বয়স এখন ৪৯ বছর। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এটি খুব বেশি দীর্ঘ সময় না হলেও একটি জাতির উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য একেবারে কম নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, যে লক্ষ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, সেই লক্ষ্য ও আদর্শ কতটা অর্জিত হয়েছে? স্বাধীনতার প্রধান আকাঙ্খা ছিল সব ধরনের অধীনতা থেকে মুক্তি এবং সমাজে গণতন্ত্র, ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা। সব নাগরিকের মৌলিক চাহিদা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে বাহাত্তরের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু আজীবন বাংলার গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্যই লড়াই করেছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন জেলে। তাঁর সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখতে আত্মনিয়োগ করেন। জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে ঐক্যবদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর হাত ধরে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকীতে আজকের বিজয় দিবসের শপথ হোক, সব ধরনের হানাহানি ও বৈরিতা বিদ্বেষকে পেছনে ফেলে, দেশ ও জনগণের কল্যাণে সবাই এক হয়ে কাজ করব। বঙ্গবন্ধু যেমন যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে নামার আহবান জানিয়েছিলেন, আমাদেরও উচিত এখন যার যার অবস্থানে থেকে দেশের কল্যাণে কাজ করা। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের দায়িত্বটাকে সঠিকভাবে পালন করি, নিজের কর্তব্য এড়িয়ে না যাই, তবেই এই বাংলা হবে সবার প্রিয় সোনার বাংলা। বিজয়ী জাতি কখনোই পরাভব মানে না। বাংলাদেশ তার লক্ষ্যে অবিচল থাকবে।

জয় বাংলা
জন্ম থেকেই ভালবাসি
তোমায় বাংলাদেশ
মরণ যদিও আসে আমার
তবুও হবেনা শেষ।

এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী
সদস্য (অর্থ)
বাতীবো, ঢাকা।

মোঃ আইয়ুব আলী
প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

সম্পাদকীয়

আজ ১৬ ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয় দিবস। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূ-খন্ডের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার এক চিরস্মরণীয় দিন। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্মের শততম বছর পূর্তি উপলক্ষে সরকার এ সালকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করেছে, যা বিজয় দিবসের মর্যাদাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, আরও তাৎপর্যময় করে তুলেছে। যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান, জনাব শাহ আলম মহোদয় বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের পক্ষ হতে প্রথম বারের মত একটি অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের মুক্তির সংগ্রাম ও একাত্তর সালের ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথ বেয়ে এসেছে বাঙালির বিজয়। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশ নিতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র-বাংলাদেশের। লাল-সবুজ পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে বিজয়ী বাঙালি। সেই পতাকা উঁচিয়ে প্রগতির পথে চলেছে বাঙালির অভিযাত্রা।

মহান বিজয় দিবসের প্রতিপাদ্য নিয়ে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের ছেলে-মেয়েরা হয়ত কোন দিন লিখেন নি; তারাও আজ লিখেছেন। আবার হয়ত কোথাও কোন দিন কারও কোন লেখা প্রকাশ হয়নি, তারাও লিখেছে; তাদের ভাবনা চিন্তাগুলো কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেছে। কাজেই লেখাগুলোতে ভুলত্রুটি থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমি পাঠকদের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভুল-ত্রুটি মার্জনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে অনলাইন ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করা সহজ হয়েছে। বাতাঁবো এর সদস্য (অর্থ), জনাব এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী মহোদয় ম্যাগাজিন প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন। ম্যাগাজিন প্রকাশনা কমিটির সদস্যগণ বিশেষ করে জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সহকারী প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ) এবং জনাব মেহেরী আফসানা, পরিসংখ্যানবিদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অনলাইন ম্যাগাজিনটি পড়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি এবং এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আইয়ুব আলী)

প্রধান উপদেষ্টাঃ
মোঃ শাহ আলম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

উপদেষ্টাঃ
০১) কাজী মনোয়ার হোসেন (অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এসএন্ডএম), বাতাঁবো, ঢাকা

০২) এএসএম মামুনুর রহমান খলিলী (যুগ্ম সচিব)
সদস্য (অর্থ), বাতাঁবো, ঢাকা

০৩) ডা: জাকির হোসেন এনডিসি (অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (ওএন্ডএম), বাতাঁবো, ঢাকা

০৪) গাজী মোঃ রেজাউল করিম (যুগ্ম সচিব)
সদস্য (পরিঃ ও বাস্তঃ), বাতাঁবো, ঢাকা

সার্বিক সহায়তায়ঃ
এএসএম মামুনুর রহমান খলিলী (যুগ্ম সচিব)
সদস্য (অর্থ) ও আহবায়ক অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশ কমিটি, বাতাঁবো, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদঃ
১মোঃ আইয়ুব আলী
প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ), বাতাঁবো, ঢাকা

২মোঃ সাদাকাতুল বারি
নির্বাহী প্রকৌশলী, বাতাঁবো, ঢাকা

৩মোঃ মতিউর রহমান
সহকারী প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ), বাতাঁবো, ঢাকা

৪মেহেরী আফসানা
পরিসংখ্যানবিদ, বাতাঁবো, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজঃ
মোঃ ইসমাইল
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, বাতাঁবো, ঢাকা

প্রকাশকালঃ
১৬ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

প্রকাশনায়ঃ
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
www.bhb.gov.bd

বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে গঠিত অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশ সংক্রান্ত কমিটি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১	এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী (যুগ্ম সচিব) সদস্য (অর্থ), বাতাঁবো, ঢাকা।	আহবায়ক
২	মোঃ আইয়ুব আলী প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ), বাতঁবো, ঢাকা।	সদস্য
৩	মোহাম্মদ ইছা মিয়া উপ-প্রধান (এমই), বাতাঁবো, ঢাকা।	সদস্য
৪	মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (অপারেশন), বাতাঁবো, ঢাকা।	সদস্য
৫	মোঃ সাদাকাতুল বারি নির্বাহী প্রকৌশলী, বাতঁবো, ঢাকা।	সদস্য
৬	মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন চৌধুরী সহকারী প্রধান (অর্থ), বাতাঁবো, ঢাকা।	সদস্য
৭	মোঃ মতিউর রহমান সহকারী প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ), বাতাঁবো, ঢাকা।	সদস্য
৮	মোঃ আবুল বশর ভূঁইয়া পিএ টু সদস্য (পরিঃ ও বাস্তঃ), বাতাঁবো, ঢাকা।	সদস্য
৯	মেহেরী আফসানা পরিসংখ্যানবিদ, বাতাঁবো, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	প্রবন্ধ/গল্প/কবিতার নাম	প্রাবন্ধিক/গল্পকার/কবির নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	অপারেশন ওয়াজ্জার পুল: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন কিশোর বয়সে দেখা প্রতিরোধ	মোঃ শাহ আলম, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	১-২
২	বিজয় মহান, বিজয়ের সংগ্রাম মহত্তর	এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী সদস্য (অর্থ), বাতাবো, ঢাকা	৩-৪
৩	স্বাধীনতা এবং তোমার প্রত্যাশা	মো: আইয়ুব আলী প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)	৫-৬
4	War of Independence of Bangladesh	Mohammad Issa Mian Deputy Chief (M& E)	৭-১০
৫	সংগ্রাম	মোঃ আবুল বশর ভূঁইয়া সাঁটলিপিকার	১১
৬	How can you slow down the spread of COVID-19?	BY Luba Khalili (Daughter of Member (Finance), BHB & Dr. Anabeel Sen	১২-১৩
৭	আমার কান্না	সারা হক (৫ম শ্রেণি) সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুল পিতা: মোঃ সাইফুল হক	১৪
৮	আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা	সাইফুল ইসলাম খান সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)	১৫-১৯
৯	দূর্নীতি রুখবো	মোঃ সাহাবউদ্দিন চৌধুরী সভাপতি বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ)	২০
১০	তাঁত শিল্পের উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকারের অবদান	মোঃ মতিউর রহমান সহকারী প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ)	২১-২৮
১১	বিজয়ের দিনে নতুন বিজয়	মেহেরী আফসানা পরিসংখ্যানবিদ	২৯-৩০
১২	পুনর্জন্ম	মো: মেহেদী হাসান সহকারী মহাব্যবস্থাপক(দায়িত্বপ্রাপ্ত) এসএফসি, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	৩১
১৩	বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ	মোঃ গোলাম রব্বানী, উচ্চমান সহকারী মার্কেটিং অনুবিভাগ	৩২-৩৫
১৪	স্বাধীনতা, বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন উচ্চমান সহকারী	৩৬
১৫	৩টি নির্বাচিত কবিতা	মোঃ সাদমান সাকিব(লিয়ন) পিতাঃ মোঃ গোলাম রব্বানী তৃতীয় শ্রেণিন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল ,	৩৭-৩৯
১৬	বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ	মোঃ বিল্লাল হোসাইন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ৫টি ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	৪০ ৪৩
১৭	চেতনায় স্বাধীনতা	সুকুমার চন্দ্র সাহা, প্রধান হিসাবরক্ষক	৪৪

অপারেশন ওয়াজ্জার পুল: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন কিশোর বয়সে দেখা প্রতিরোধ

মোঃ শাহ আলম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

রায়পুর ছিল ১৯৭১ সনে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার যোগাযোগ উন্নত একটি থানা। ঢাকা চট্টগ্রাম এর সাথে ছিল সরাসরি সড়ক যোগাযোগ আর নদীপথে চাঁদপুর হয়ে ঢাকা মুন্সিগঞ্জ নারায়নগঞ্জের সাথে লঞ্চ যোগাযোগ। এ থানার অর্থকরী ফসল ছিল পাট, সরিষা বীজ, পান, নারিকেল, সুপারি, মরিচ, রসুন, পেয়াজ। মেঘনা ডাকাতিয়া নদী ছিল রুপালি ইলিশ সহ রকমারি মৎস সম্পদের বিশাল উৎস। বাগ বাগিচায় ম্যাচ কারখানার কাঁচা মাল শিমুল, কদম গাছের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব মূল্যবান অর্থকরী সম্পদ রপ্তানি হতো দেশের অন্যান্য অঞ্চলে। স্বাভাবিক কারণেই ব্যবসা বাণিজ্যের একটা আদর্শ জনপদ হয়ে উঠেছিল রায়পুর থানা সদর। রাজধানী বন্দর নগরীর সাথে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এ থানার জনগণ ছিল রাজনৈতিকভাবে ইর্ষণীয় সচেতন। জাতীয় নেতা মরহম রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহ, মরহম কমরেড আবুল বাসার, স্থানীয় রাজনীতির প্রতিভূ মরহম মাওলানা ছাইফুল আলম ইত্তেহাদী, মরহম ফজলুল করিম চৌধুরী, মরহম আব্দুর রশিদ গান্ধী, মরহম বশির উল্লাহ মাস্টার, মরহম ছফি উল্লাহ মাস্টার, মরহম অধ্যাপক সিরাজুল হক, মরহম আব্দুল জলিল, যুব নেতা মরহম নুরুল ইসলাম আজুব, জনাব আবুল হোসেন, মরহম মোহাম্মদ আমিন, তুখোড় ছাত্রনেতা মরহম নবী নেওয়াজ করিম (বকুল চৌধুরী), অধ্যাপক জিয়াউল হক, প্রকৌশলী আজহারুল হক (দুলাল) এবং তাঁর ভ্রাতা জাকির হোসেন খসরু, এজাজ আহমেদ, মরহম আহসান উল্লাহ মুন্সী (কমর উদ্দিন, মুন্সী বাড়ি), মরহম শহীদ উল্লাহ মুন্সী প্রমুখ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় স্থানীয় পরিচিতির বাইরেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে বৃহত্তর জেলায় আলোচিত ছিলেন। এমন নিবেদিত নেতাদের বিরামহীন রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্মকান্ডেই দেশের অন্যান্য জনপদের চেয়ে রায়পুর ছিল অনেক বেশি উজ্জীবিত। উর্বর উজ্জীবিত রাজনৈতিক কারণেই ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রায়পুরে জনসভা করেছিলেন। সে সময় বঙ্গবন্ধুকে একটি থানা কেন্দ্রিক জনসভায় উপস্থিত হতে উৎসাহিত করেছিল রায়পুরের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও কমিটমেন্ট। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিকভাবে অগ্রসর জনপদ হিসেবে বিবেচিত হবার কারণেই ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর দ্রুততম সময়ে পাক বাহিনী রায়পুরে হানা দেবে এটা অনেকটাই নিশ্চিত ছিল।

রায়পুর বাজারে হাট বসতো সপ্তাহে শুক্র ও সোমবার। হাজার হাজার ক্রেতা বিক্রেতার ভীড়ে হাটের দিন বাজারে প্রায়ই জনতার জট লেগে যেত। অন্যদিন বাজারে না গেলেও শুক্রবার হাটের দিন দুপুরের পর মাছ তরকারী, কেরোসিন, লবন ইত্যাদি নিয়ে আসার জন্য আমি বাজারে যেতাম।

এমনি এক শুক্রবার বর্তমান গাজী মার্কেটের সামনে মুড়ি হাটায় জুম্মার নামাজের পর ভেষজ সালসা বিক্রির জন্য লোক জড়ো করতে হারমোনিয়াম, ঢোল, বাঁশির মাধ্যমে গানবাজনা হচ্ছিল। আমি শুনছিলাম। অকস্মাত বাজারে হড়ো হড়ি শুরু হলো। বলাবলি হচ্ছে পাক বাহিনী রায়পুর পানপাড়া সড়ক হয়ে রায়পুর আক্রমণ করতে আসছে। আওয়ামীলীগ নেতা মরহম আব্দুর রশিদ গান্ধী হন্তদন্ত হয়ে ধান হাটার দিক (পশ্চিম বাজার) থেকে শাবল, কোদাল, হাতুড়ি, রড, করাত ইত্যাদি সজ্জিত ১০/১২ জন লোক নিয়ে স্টেশন রোডের দিকে (পূর্বদিকে) ছুটছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য রায়পুর পানপাড়া রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। ল্যাংড়া বাজার হতে ৩/৪ কিমি দুরে ওয়াজ্জার পুল ভেঙ্গে পানপাড়া হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের গাড়ি বহর রায়পুর ঢুকার পথ বন্ধ করে তা করা সম্ভব। অপারেশনের গন্তব্য ওয়াজ্জার কাঠের পুল। এ দলটি ল্যাংড়া বাজার পানপাড়া রোডের দিকে এগিয়ে চলল। আমিও তাঁদের পিছু নিলাম। অসম্ভব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল তাঁরা। পথে পথে যোগ হচ্ছিল আরো লোকজন এবং এক পর্যায়ে তা লম্বা মিছিলে পরিণত হলো। জয়বাংলা স্লোগান দিতে দিতে একসময় মিছিল পৌঁছে গেল লক্ষ্যস্থলে। আমি হাঁফিয়ে উঠছিলাম। শুরু হলো পুলের পাটাতন খোলার কাজ। যে যেভাবে পারছে পুল ভাঙ্গার কাজ করছে। ঘন্টা দুই সময়ের মধ্যে কাঠের সব পাটাতন খুলে ফেলা হলো। কাঠ খোলা হলে আমি সেগুলো ১৫/২০ হাত দুরে নিয়ে ডাম্প করার কাজে অন্যদের সাথে যোগ দিলাম। তারপর কাঠের স্তুপে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয়া হলো যেন সেগুলো এনে পুনরায় পুল মেরামত করা না যায়। কেউ একজন বলে উঠলো পাকিস্তানিদের জীপ্ নাকি

জাম্প দিয়ে পুলের দুরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এবার শুরু হলো সেতুর দু-পাশের কাঁচা রাস্তা কাটা। মাথায় করে এবার কাটা মাটি নিকটস্থ খালে ফেলার কাজে যোগ দিলাম। প্রায় ৮/১০ হাত পরিমাণ রাস্তা কেটে রাস্তা যান পারাপারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করা হলো ।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এবার ফেরার পালা। কিন্তু যাবার সময় যত মানুষ ছিল ফেরার সময় তত নেই। কাজী বাড়ি পর্যন্ত আসতে আসতে ২/৩ জন ছাড়া আর কেউ নেই। রায়পুর বাজার পর্যন্ত আসতে না পারলে বাড়ি ফিরতে পারব না এ ভয় আমাকে পেয়ে বসলো। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরলাম বেশ রাতে। তখন বাড়িতে সবাই আমার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। মা কান্না কাটি করছেন। আব্বা সারা বাজারে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমাকে পেলেন না। কেউ আমার খবর দিতে পারল না। সেদিন সন্ধ্যার আগেই বাজার ভেঙ্গে গেছে।

বাড়িতে পৌঁছেই আব্বার মুখোমুখি হলাম। কিন্তু আশ্চর্য হলাম নিজের অকুতোভয় অবস্থা দেখে। কঠিন স্বরে আব্বা জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ছিলাম এত রাত পর্যন্ত। আমি ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে জবাব দিলাম পুল ভাঙ্গতে নয়া হাট গেছি। আব্বা হতবাক! আর কিছু বলার আগেই নানী আমাকে এক টানে আব্বার সামনে থেকে নিয়ে গেলেন। ওয়াজ্জার পুল ভাঙ্গতে যাবার কথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। তার ২/৩ দিন পরই লক্ষীপুর থেকে পাকিস্তানি বাহিনী এসে গোলাবাড়ি, মুন্সিবাড়ি (হাসপাতালের সামনের) সহ রায়পুরের বেশ কয়েকটি বসত বাড়ি এবং রায়পুর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ শতাধিক দোকানপাট জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। ৮/১০ দিন পর এসে স্থায়ী ক্যাম্প বানালো রায়পুর এল এম হাই স্কুলে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ওয়াজ্জার পুল ভাঙ্গার মত অসংখ্য স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধ হয়েছে দেশের সর্বত্র। মুক্তিযুদ্ধের বিশাল ক্যানভাসে হয়ত এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। কিন্তু বিগত তেতাল্লিশ বছরে কিশোর বয়সের এ স্মৃতি বহবার আমাকে সুখানুভূতির পরশ বুলিয়ে দিয়েছে। ওয়াজ্জার পুল ভেঙ্গে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ আমার জীবনে নি:সন্দেহে একটা অমোচনীয় সুখ জাগানিয়া স্মৃতি।

(পাদটিকা: ধর্মীয় সাধক, সমাজসেবী মরহুম মাওলানা ওয়াজি উল্লাহ (র:) উদ্যোগী হয়ে তাঁর বাড়ির পাশে পানপাড়া রায়পুর সড়কের নয়া হাটে যে কাঠের সেতু নির্মাণ করেন তা স্থানীয়ভাবে ওয়াজ্জার পুল নামে পরিচিত ছিল)।

বিজয় মহান, বিজয়ের সংগ্রাম মহত্তর

এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী
সদস্য (অর্থ), বাতাঁবো, ঢাকা

১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করেছিল। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জন করলেও এই বিজয়ের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল অনেক আগে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম ছাত্রলীগ। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের এক সমাবেশে ঘোষণা করেন, উর্দু, এন্ড অনলী উর্দু শ্যাল বি দ্য স্টেট ল্যাংগুয়েজ অফ পাকিস্তান। তখন ছাত্রলীগের কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবেই নো নো বলে প্রতিবাদ করে উঠে।

১৯৪৯ সালে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে দুর্বার আন্দোলন শুরু করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৪৪ ধারা জারী করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভংগ করে এগিয়ে গেলে নুরুল আমিন সরকারের পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণ করলে শহীদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার।

১৯৫৪ সালে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। পুর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হন। যদিও এই সরকার বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করেনি। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা সংবিধানের ৯২ ক ধারায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসন কায়েম করে।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংগালীর মুক্তি সনদ ৬ দফা ঘোষনা করেন। ৬ দফাসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

প্রস্তাব ১: শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

এদেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদ নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সাধারণ ভোটে।

প্রস্তাব ২: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যথা দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব ৩: মুদ্রা বা অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

(ক) সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। অথবা (খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন এমন ফলপ্রসু ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে মুলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

প্রস্তাব ৪: রাজস্ব কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সব রকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব ৫: বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

(ক) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বানিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে। (খ) বহির্বানিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এক্তিয়ারাধীন থাকবে। (গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলো মিটাবে। (ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা নিষেধ থাকবে না। (ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব ৬: আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা
আঞ্চলিক সম্প্রীতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা সামরিক বা আঞ্চলিক বাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

৬ দফাকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ৬ দফা বাংগালীর প্রানের দাবী হিসেবে পরিগনিত হয়। জেনারেল আয়ুব খান কোন উপায়ান্তর না দেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৯ সালে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ১১ দফা দাবী নিয়ে ছাত্ররা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের এই আন্দোলন ধীরে ধীরে গন আন্দোলন ও গন অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। গণ অভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল আয়ুব খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে জেনারেল আয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ক্ষমতার মসনদ থেকে বিদায় হয়।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা পাকিস্তানে সংখ্যা গরিষ্টতা অর্জন করে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় ঘোষনা করেন, এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে ঢাকায় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমন শুরু হলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষনা দেন। বীর বাংগালী অস্ত্র হাতে নিয়ে হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় অর্জিত হয়। বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

১৯৭১ সালে আমাদের বিজয় অর্জিত হলেও বিজয়ের সংগ্রাম শেষ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রাম এখনো চলছে। ২০০৯ সাল থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানের লক্ষ্যে।

জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এখন বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি অর্জনের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পথে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১৮৪১ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বার্ষিক জিডিপির প্রবৃদ্ধি গত কয়েক বছর যাবত ৬% এর উপরে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পথে দেশ। ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম এখনো চলছে। বিজয়ের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। ১৯৭১ সালে অর্জিত বিজয় ছিল আমাদের এক মহৎ অর্জন। আমাদের চলমান অর্থনৈতিক বিজয় অর্জনের সংগ্রাম মহত্তর।

স্বাধীনতা এবং তোমার প্রত্যাশা

মো: আইয়ুব আলী
প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)

স্বাধীনতা
ফুলে ফুলে সুশোভিত বৃক্ষ শাখা
পাখির কল-কাকলীতে মুখরিত উদ্যান।

স্বাধীনতা
বৈশাখের দাবদাহে তৃষ্ণার্থ কাকের কষ্টার্জিত জল।

স্বাধীনতা
কৃষ্ণচূড়ার হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া বিমুগ্ধ যৌবন।

স্বাধীনতা
বেল, জুঁই, শেফালী, চাঁপার পুষ্পাচ্ছাসে ছুটে আসা দোয়েল, কোয়েল
মৌটুসী, টুনটুনি, চোখ গেল, বউকথা কও পাখির গান।

স্বাধীনতা
রমনীর বেনী বন্ধে বাঁধা
রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, নাগকেশরের গন্ধ।

স্বাধীনতা
বর্ষায় ফুটে থাকা শাপলা, পদ্ম, কলমী
শালুকের অপরুপ সৌন্দর্য্য;
বাংলার জলাশয়ে ডাহুক, বুনোহাঁস, সারষ, বক
বালিহাস, নীল তিতির-এর উল্লাস।

স্বাধীনতা
বাদলের চামেলী,কালো আঁখি জল।
মুসান্ডা, রংগন, জবা, পলাশ, করবীর
কংকন ঝংকার সুরে নিশ্চল।

স্বাধীনতা
শীতের সকালে দোয়েল কোয়েল,শ্যামা, টুনটুনি
ময়না, চড়ুই, বুলবুলির অবাধ বিচরণ।

স্বাধীনতা
প্রিয়ার বেলী ফুলের মালা
জোছনা ধারা রাতে মহুয়ার সুবাস
নয়ন তারার হালকা নীল সাদার মাঝে গোলাপী চোখ।

স্বাধীনতা
বিল হালতির পানকৌড়ী, হাড়গিলা
মাছরাঙ্গার মৎস্য শিকার।

স্বাধীনতা
নীলমনি লতা, কসমস, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা
পপি, মাধবী লতার মঞ্জীরে মঞ্জীরে ভ্রমরার গুঞ্জন।
বকুল, হিজল, পারিজাত, কদম্ব কেশরের
নিদ্রাহীন বেদনার বাণ।

স্বাধীনতা
তুমি আমাদের দুঃখকে গ্রাস করে আনোসুখ।
স্বাধীনতা, আমরা তোমার স্পর্শ চাই
নির্ভয়ে মুক্তমনে বেঁচে থাকতে চাই।

স্বাধীনতা
তুমি আসো অশুভ শক্তির অদৃশ্য শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে।
স্বাধীনতা, আমরা তোমার জন্য কাঁদি।
প্রতিটি সূর্য্যের অপেক্ষায় থাকি।

War of Independence of Bangladesh

Mohammad Issa Mian
Deputy Chief (Monitoring and Evaluation)

Background:

During the partition of India and Pakistan as a country, gained independence on August 14, 1947 following the end of British rule over South Asian Countries. The division was made based on religion. Pakistan was created out of Muslim majority territories in the West and East, and India was created out of the vast Hindu majority regions in the center. The western zone was popularly called West Pakistan and the Eastern zone (modern day Bangladesh) was called East Bengal and later, East Pakistan.

Reasons for War:

Economic Exploitation:

West Pakistan dominated the divided country and received more money than the more populous East. Between 1948 and 1960,East Pakistan's export earnings had been 70% while it only received 25% of import earnings. In 1948, East Pakistan had 11 textile mills while west had 9.In 1971, the no of textile mills in the West had grown to 150 while that in the East had only gone up to 26. A transfer of 2.6 billion dollarsworthhasresources was also done over time from East Pakistan to West Pakistan. More owe it was fell that much of the income generated by the East was primarily diverted towards fighting wars in Kashmir.

Different in religious standpoints:

One of the key issuewas the extent which Islam was followed. West Pakistan with on overwhelming 97% Muslim [Population as less liberal than East Pakistan which was at least 15% non-Muslim(mainly Hindus).Bengalis are proud of their common literary and cultural heritage. The difference was made further clear after Bangladeshi independence, when Bangladesh was established was a secular country under the name "Peoples' Republic of Bangladesh" rather than as the "Islamic republic of Bangladesh".This was in tribute to all those, Muslim and non-Muslim,who had takenpart in the independence struggle.

Other factors including language:

In 1948, Mohammad Ali Jinnah declared in Dhaka, capital of East Pakistan, that "Urdu and Only Urdu, shall be the state language of Pakistan". While Bangla was spoken by the majority of people of East Pakistan. When he declaredit, East Pakistan revolted and several students and civilians lost their lives on February 21, 1952. The day is revered in Bangladesh and in West Bangla as the language Martyrs' Day.

Political Climax:

The political prelude to the War included several factors. Due to the different between the two states, a nascent separatistmovement developed in East Pakistan. Any such movements were sharply limited, especiallywhen Martial law was in force between 1958 and 1962 (UnderGeneralAyub Khan) and between 1969 and 1972 (Under General Yahya Khan). These military rules where of West Pakistan origin and continuedto favor West Pakistan in terms of economic advantages.

The situation reached a climax when in 1970 the Awamileague,the largest East Pakistani political party, led by Sheikh Mujibur Rahman, won a landslide victory in the national elections winning 167 of the 169 seats allotted for East Pakistan and a majority of the 313 total seats in the National Assembly. This victory gave the Awamileague the right to form a government.

However, the leader of Pakistan people's party Zulfikar Ali Bhutto, refused to allow Rahman to become the prime Minister of Pakistan. Instead, he proposed a notion of two Prime Ministers. Bhutto also refused to accept Rahman's six points which would result in autonomy for East Pakistan. On March 3, 1971, the two leaders of the two wings along with the President General Yahya Khan met in Dhaka to decide the fate of the country. Talks failed. Sheikh Mujibur Rahman called for a nation-wide strike.

General Tikka Khan was flown into Dhaka to become Governor of East Bengal. East Pakistani judges, including Justice Siddique, refused to swear him in.

Mv Swat, a Ship of the Pakistani Navy, carrying ammunition and soldiers, was harbored in Chittagong port and Bengaliworkers and sailors at the port refused to unload the ship. A unit of East Pakistan Rifles refused to obey commands to fir on Bengali demonstrators, beginning a mutiny of Bengali soldiers.

Between March 10 and 13, Pakistan International Airlines cancelled all their internal routes to urgently fly "Government Passengers" to Dhaka. These so-called "Government Passengers" were almost exclusively Pakistani soldiers in civil uniform.

Bongobondhu's speech on March 7:

On March 7, 1971, Bongobondhu (friendof the Bengalis) Sheikh Mujibur Rahman gave a speech at the Racecourse Ground (now called the Suhrawardy Udyan). In this speech he directed to turn every house into a fort of resistance. He closed his speech saying," The struggle this time is for our freedom. The struggle this time is for our independence."

Violence and clashes of March 25:

On the night of March 25, Pakistan Army began a violent effort to suppress the Bengali opposition.In Bangladesh, and elsewhere, the Pakistaniactions are referred to as "genocide". Before carrying out these acts, all foreign journalists were systematically deported from Bangladesh. Bengali members of militaryservices were disarmed. The Operation was called "Operation Searchlight" by Pakistani Army and was carefully devised by several top-ranked army generals to "crush" Bengalis.

Sheikh Mujibur Rahman was considereddangerous and hence, he was arrested by Pakistan Army. AwamiLeague was banned by General Yahya Khan.

Declaration of Independence:

On March 26, 1971, the nation waged an armed struggle against the Pakistani occupation forces following the killings of the night of 25 March. The Pakistani forces arrested Sheikh Mujib, who through a wireless message, had called upon the people to resist the occupation forces.

On March 26, 1971, M.A. Hannan, An AwamiLeague leader from Chittagong, is said to have made the first announcement of the declaration of independence over radio. Sheikh Mujibur Rahman signed an official declaration on March 25, 1971 that read:

"Today Bangladesh is sovereign and independent country. On Thursday night West Pakistani armed forces suddenly attacked the police barracks at Razarbagh and the EPR headquarters at Pilkhana in Dhaka. Many innocent and unarmed have been killed in Dhaka city and other places of Bangladesh. Violent clashes between EPR and police on the one hand and the armed forces of Pakistan on the other, are going on. The Bengali are fighting the enemy with great courage for an independent Bangladesh. May God aid us in our fight for freedom, Joy Bangla."

A telegram reached some students in Chittagong. They realized the message could be broadcast from Agrabad Station of Radio Pakistan. They failed to secure permission from higher authorities to broadcast the message. They crossed Kalurghatbridge into an area controlled by East BengalRegiment under Major Ziaur Rahman. Bengali soldiers guarded the station as engineersprepared for transmission. At 19:45 On March 26, 1971. Major Ziaur Rahman Broadcast another announcement of the declaration of Independence on behalf of Sheikh Mujibur which is as follows:

This is Shadin Bangla BetarKendro. I, Major Ziaur Rahman, at the direction of Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman, here by declare that the independent Peoples' Republic of Bangladesh has been established. At this direction, I have taken commandas the temporary Head of the Republic. In the name of Sheikh Mujibur Rahman, I call upon all Bengalis to rise against the attack by the West Pakistani Army.We shall fight to the last to free our Motherland. By the grace of Allah, victory is ours. Joy Bangla."

Kalurghat Radio Station's transmission capability was limited. The message was picked up by a Japanise ship in Bay of Bengal and then re-transmitted by Radio Australia and later the British Broadcasting Corporation (BBC).

March 26, 1971 is hence considered the official "Independence Day" of Bangladesh.

End of the War and Victory of Bangladesh:

After the declaration of independence,the Pakistan Military sought to quell them, but increasing numbers of Bengali soldiersdefected to the underground Bangladesh Army. These Bengali units slowly merged into the Mukti Bahini and bolstered their weaponry. They then jointly launched operations against the Pakistan Army to inductRazakars, a paramilitary force, from the local populace to bolster their numbers. These people were essentiallyviewed as traitors and with suspicion by local Bengalis.

Meanwhile, On the ground, nearly three brigades of Mukti Bahini along with the India forcesfought in a conventional formation. This was supplemented by guerilla style attacks on Pakistanis who were facing hostilities on land, air, water in both covert and overt ways. Undeterred, Pakistan tried to fight back and boost the sagging morale by incorporating the special services Group commandos in sabotage and rescue missions. This however could not stop the juggrmant of the invading columns whose speed and power were too much to contain for the Pakistan Army. On December 16, 1971, within Just 12 days, the capital Dhaka fell to the MitroBahini-the allied forces. Lt. Gen. Niazisurrendered to the combined forces headed by its commander Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora by singing the instrument of surrender at RamnaRacecourse, 16:31 Indianstandardtime Bangladesh became liberated. December 16 is the victory day of Bangladesh.

সংগ্রাম

মোঃ আবুল বশর ভূঁইয়া
সাঁটলিপিকার

সংগ্রাম যেন বাঙালি জাতির ললাট লিখন
আপন কৃষ্টিতে চলতে-
এমন কি মায়ের ভাষা বলতে; বুকের রক্তে
রাজপথ রাঙাতে হয়েছে বাঙালি জাতিকে।

জীবন ও জীবিকার জন্য অহর্নিশ সংগ্রাম
কখনো রাজপথে-
কখনো হৃদয়ের অলিগলিতে; দেখা মেলে
বাঙালির গূঢ় সংগ্রামের অব্যক্ত ইতিহাস।

দেহের সাথে সংগ্রাম, মনের সাথে সংগ্রাম
রিপুর সাথে সংগ্রাম-
ভাগ্য বিধাতার সাথে সংগ্রাম; স্বাধীন দেশে
স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রাণপণ সংগ্রাম।

How can you slow down the spread of COVID-19?

BY LUBA KHALILI (Daughter of Member (Finance)
AND
DR ANABEEL SEN

Panic and pandemic are in the air. Cough etiquette and social distancing are the new buzzwords. Granted, the novel coronavirus is the newest threat to humans, and new information is being discovered as we write. What do we know about this virus, so far? How can we utilise this information to keep ourselves and our loved ones safe?

The basics

The virus originated from an animal and infected a human host, in December 2019 at a seafood market in Wuhan, China. Since then, it has been able to travel the world through human hosts, infecting about 169,300 people worldwide – according to data from John Hopkins University, which has been mapping the 2019-nCoV outbreak.

This strain of the coronavirus attacks the respiratory system, causing a disease called COVID-19. According to the World Health Organisation, the infection can sometimes cause pneumonia, kidney failure, and even death.

Good news: In about 80% of the cases, COVID-19 is self-limiting, meaning patients will recover on their own without needing external medical assistance.

Bad news: The elderly and those with comorbid conditions such as diabetes, heart problems, and asthma, run the most risk of becoming seriously ill from COVID-19. This doesn't mean young people are off the hook – the novel coronavirus is extremely infectious/contagious. That's why healthy, young people run the risk of transmitting the virus to people around them, and thus, need to practice basic hygiene measures at all times.

How do we catch COVID-19?

When we sneeze or cough, we let out tiny droplets into the air. When an infected person does this, they allow for the virus to spread. The droplets either land on surfaces around the person, and other people catch it by touching the surfaces, then touching their eyes, nose, or mouth with contaminated hands.

It is also possible to become infected if one is too close to an infected person (via their cough or breath) and WHO recommends that people stay at least three feet away from people exhibiting signs of sickness.

How do I know I have it?
It is easy to confuse COVID-19 with a common cold or the flu (it is flu season after all), but fever with a dry cough is enough to merit seeking medical assistance. Symptoms can take about 2-14 days to appear.

WHO says people can catch the disease from someone who does not even feel unwell, but as a mild cough. The subtle ways in which the disease manifests makes vigilance extremely important.

Squeaky clean and super safe
Practicing hygiene is the best way to stay safe from the virus. Why? A layer of lipid (oily fat) surrounds the novel coronavirus. Soaps are designed to break apart grease and fat bonds, and so when we effectively wash our hands (watch a quick video on the proper way to get our hands squeaky clean), the soap breaks through the outer layer of the virus, making it difficult for the virus to survive for long.

As we live through this pandemic, it is important that the practice of washing hands is instilled in every single person. Washing hands should be done routinely and mindfully. There are obvious signs of when to wash hands, such as when they are visibly unclean, or after touching something dirty or using the loo. But in these drastic times, we should also be mindful to clean up:

After sneezing or coughing
Before and after caring for someone ill
Food – before and after preparing food, as well as eating it
Under the weather?

Feeling unwell and coughing? Mask on. If there is a shortage of resources, masks should be kept for those who are sick and those caring for them. Note that disposable masks should be changed every eight hours

.
Cough etiquette is important in the midst of an outbreak such as this. When coughing or sneezing, it is recommended to do so in a tissue (to be discarded in a closed bin), or into our elbow – not our hands.

As the world discovers the novel coronavirus a little bit more each day, we would do well to not panic. Keeping an eye out for new information on the virus can help us understand our actions a lot better (WHO is a great source – read their myth-busting on the virus). Even amidst the pandemic, prevention is simple.

We can all do our bit to prevent the spread of COVID-19, even if we haven't been infected. By steering clear of crowds, keeping ourselves and our spaces clean, and not touching our face, it is possible to keep the novel coronavirus at bay. We can, at the very least, slow the spread of COVID-19.

আমার কান্না

সারা হক (৫ম শ্রেণি)
সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুল
পিতা: মোঃ সাইফুল হক

আকাশ কাঁদে, বাতাস কাঁদে
কাঁদে নদীর জল;
কাঁদে সাগরের ঢেউ।
আমি কাঁদি তোমার-
৭ মার্চ এর ভাষণ শুনে।
বোন কাঁদে তোমার-
রক্তমাখা ছবি এঁকে এঁকে।
এ কান্না শুধু তোমার-
না পাওয়ার;
এ কান্না শুধু তোমায় –
হারাবার।
তবুও তুমি থাকবে চিরকাল-
মানচিত্রে যতদিন থাকবে এদেশ
ততদিন ধরে বঙ্গবন্ধু-
তোমাকেই মনে রাখবে বাংলাদেশ।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

সাইফুল ইসলাম খান
সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

ভূমিকাঃ

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি..। পৃথিবীর কোনো জাতিই পরাধীন হিসেবে থাকতে চায় না। পরাধীন হতে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীর অনেক জাতিই মুক্তির সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছে। এর ব্যতিক্রম বাংলাদেশও নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এক রক্তাক্ত ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস। সুদীর্ঘ ০৯ (নয়) মাস মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। তবে এ স্বাধীনতা সহজভাবে আসেনি। ১৯৭১ সালে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন এবং দুই লক্ষ মা-বোন নির্যাতিত হন। পৃথিবীর কোনো জাতিই এত কমসময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বেদনাদায়ক হলেও তা গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় চির ভাস্বর। তাই দেশপ্রেমের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে-

"সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়,
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার/তবু মাথা নোয়াবার নয়।"

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন তথা মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে একটি ঐতিহাসিক পটভূমি। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুন ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। সেদিন থেকে বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। শুরু হয় ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন। প্রায় ০২ (দুই) শত বছর চলতে থাকে ইংরেজদের শাসন, শোষণ আর নির্যাতন। শাসন-শোষণ, লাঞ্ছনা আর নিপীড়নের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাঙালির মনের কোনে জন্ম নিয়েছিল বিক্ষোভ, আন্দোলন আর সংগ্রামের চেতনা। রূপসি বাংলার রূপ- ঐশ্বর্য ও অঢেল ধন-সম্পদ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশিদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রায় দুইশত বছর শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে ১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে জন্ম নেয় স্বাধীন পূর্বপাকিস্তান নাম নিয়ে। বাংলাদেশ ছিল স্বাধীন পাকিস্তানের অংশ। কিন্তু মূলত তখনো আমরা (বাঙালিরা) প্রকৃত স্বাধীন হতে পারেনি। কারণ, পাকিস্তানের শাসকদের পক্ষপাতদুষ্ট শাসননীতির ফলে আমরা ছিলাম শোষিত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা অনেক বঞ্চিত ছিলাম। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তাঁরা স্বীকৃতি দেয়নি। উপরন্তু উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এ দেশের কৃষক, যুবক, ছাত্র-জনতা তা মেনে নেয়নি। এ দেশের জনগণ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পরে। এই অশুভ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালিরা সজাগ ছিল বলেই পাকিস্তানি শাষকদের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠে। পরবর্তীকালে, এ প্রতিরোধই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার আন্দোলন/সংগ্রামে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা-আন্দোলনঃ

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর থেকেই মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়। বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে রোধ করার জন্য ১৯৪৮ সালে

গঠিত হয় "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ"। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু" পুনরায় ঘোষণা দিলে ছাত্র-জনতা পুনরায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৫২ সালে পুনরায় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ভাষা আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠে। এ আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে মিছিল শুরু করে। উক্ত মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। শহিদ হন সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ আরও নাম না জানা অনেকে। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব বিজয় লাভ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির ক্ষমতার ভিতকে নড়বড়ে করে দেয়। পরবর্তীতে, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন স্বাধীনতা পক্ষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলো হয়। ১৯৬৫ সালের মৌলিক গণতন্ত্রের নামে জেনারেল আইয়ুব খান এক প্রহসনের নির্বাচন দিয়ে এ দেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নেয়। তখন থেকেই স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ঐতিহাসিক ০৬ দফা দাবি ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৮ সালের ০৩ জানুয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহী তথা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে আটক করা হয়। কিন্তু গণআন্দোলনের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাকে ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে টাল বাহানা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ০৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ০৪ দফা দাবি পেশ করেন এবং "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম" বলে জাতিকে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। সারা বাংলায় শুরু হয় তুমুল আন্দোলন। বাঙালিদের সাথে আপস আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করে ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গোপনে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র এনে শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গভীর রাতে পাকবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট) ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নির্বিচারে গণহত্যা চালানো হয়। রাতটি বাংলাদেশের জন্য একটি কালরাত। তাই ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস ঘোষণা করে ২০১৭ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হচ্ছে।

স্বাধীনতার ঘোষণাঃ

২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞে সারা দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৫ মার্চ মধ্য রাতে এবং ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেফতারের আগ মুহূর্তে অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করলে সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার ঘোষণা বাংলা অনুবাদ ছিল নিম্নরূপঃ

"ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহব্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।" উক্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করলে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অস্থায়ী সরকার গঠনঃ

পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কারণে বাংলার সাধারণ মানুষের বুকে আগুন জ্বলে উঠে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ খ্রি: তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার তথা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় (কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার অন্তর্গত ভবের পাড়া গ্রামে)। অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ খ্রি: তারিখে। এ সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুক্তিসংগ্রাম। মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে দেশের মানুষ দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। বাঙালি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, নারী, পুলিশ, আনসার, ইপিআর, সরকারি কর্মচারী, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধকালীন শ্লোগানঃ

সমগ্র বাঙালি জাতিকে একত্রিত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধকালীন শ্লোগান অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ শ্লোগান মুক্তিবাহিনীকে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কয়েকটি শ্লোগান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- জয় বাংলা
- অধীনতা নয় আর, চাই স্বাধীনতা
- তোমার আমার ঠিকানা/ পদ্মা মেঘনা যমুনা
- পিন্ডি না ঢাকা? ঢাকা ঢাকা
- ভুট্টোর পেটে লাথি মার/ বাংলাদেশ স্বাধীন কর
- এক দফা এক দাবি/ বাংলার স্বাধীনতা
- বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো
- ইয়াহিয়ার দুই গালে/ জুতা মারো তালে তালে
- মা-বোনেরা অস্ত্র ধরো /বাংলাদেশ স্বাধীন করো
- আমাদের সংগ্রাম /স্বাধীনতার সংগ্রাম

মুক্তিবাহিনী গঠন ও মুক্তিসংগ্রামঃ

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাক হানাদার বাহিনী আরও মরিয়া হয়ে উঠে এবং নির্বিচারে নিরীহ বাঙালিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকবাহিনীর জ্বালাও-পোড়াও, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে জীবন বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক লেঃ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর নেতৃত্বে একটি বিরাট গেরিলা বাহিনী ও নৌ কমান্ডো বাহিনী গঠন করা হয়। এর পাশাপাশি তিনি বিমান বাহিনীও গঠন করেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেন। প্রত্যেক সেক্টরে একজন কমান্ডার নিযুক্ত করেন। এ দেশের ছাত্র, জনতা, পুলিশ, আনসার, ইপিআর, ও সামরিক-বেসামরিক আপামর জনগণের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। মুক্তিবাহিনী পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালায়। দিন যতই যায় মুক্তিবাহিনী ততই সুসংগঠিত হয় । মুক্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধের রীতি অবলম্বন করে শত্রুদের বিপর্যস্ত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়েত ইসলামী, মুসলিম লীগ ও এ দেশীয় একটি গোষ্ঠী স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বাঙালার কৃতী সন্তানদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানিদের সহযোগিতাকারী দোসররা রাজাকার, আল-বদর, আল-সামস নামে বিভিন্ন ঘাতকবাহিনী গড়ে তোলে। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বয়ে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর যৌথবাহিনী গঠিত হয়। যৌথবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। ০৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ০৪ ডিসেম্বর থেকে যৌথবাহিনী সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে কুপোকাত করে ফেলে। ০৪ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকবাহিনীর সবগুলো বিমান দখল করে নেয়। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়। পাকবাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত জেনে ১৪ ডিসেম্বর বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্য দেশের খ্যাতিমান লেখক, শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী ও সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নৃশংস ও বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। এই দিনে লেখক মুনীর চৌধুরী, শহিদুল্লাহ কায়সার, দার্শনিক জেসি দেব, ডাঃ ফজলে রাব্বী, জহির রায়হানসহ অনেক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়।

হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও চূড়ান্ত বিজয়ঃ

বাঙালিরা গেরিলা রীতি অবলম্বন করে সুদীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানিদের বিপর্যস্ত করে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাকবাহিনীরা পরাজয় মেনে নেয়। এদিকে ১৪ ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ঢাকার মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৫.০০ ঘটিকায় ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি হাজার হাজার জনগণের সামনে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। আত্মসমর্পণ দলিলের নাম ছিল "INSTRUMENT OF SURRENDER"। প্রায় ৯৩০০০ (তিরানব্বই) হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি ছিল সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও সারা দেশে সকল পাকিস্তানি সৈন্যকে আত্মসমর্পণ করাতে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর সারা বাংলাদেশে মানুষ বিজয় উল্লাস করে। তাই ১৬ ডিসেম্বর দিনটি বাংলাদেশের বিজয় দিবস।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিঃ

পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের পর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের ০৬ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম ভারত এবং ০৭ ডিসেম্বর ভুটান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। পরবর্তীতে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। নিম্নে কয়েকটি দেশের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের সময়/দিন উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	স্বীকৃতি প্রদানের সময়কাল
১	ভারত	০৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
২	ভুটান	০৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১
৩	পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
৪	সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়া)	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
৫	অস্ট্রেলিয়া	৩১ জানুয়ারি, ১৯৭২
৬	যুক্তরাজ্য	০৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
৭	জাপান	১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
৮	ফ্রান্স	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
৯	যুক্তরাষ্ট্র	০৪ এপ্রিল, ১৯৭২
১০	চীন	৩১ আগস্ট, ১৯৭৫

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঃ

বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগ থেকে যে চেতনা লাভ করেছে তা জাতির সকল আন্দোলনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতি একতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ জাতি দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার পেছনে মুক্তিযদ্ধের ভুমিকা অনন্য। জাগ্রত মুক্তিসংগ্রামকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার পূরণ, নারীমুক্তি আন্দোলন, নারীশিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, সংবাদপত্রের ব্যাপক বিকাশ, সর্বোপরি গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনা ব্যাপকভাবে সমাজে বিস্তৃতি লাভ করেছে। যে আদর্শ লক্ষ্য ও চেতনা নিয়ে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের তাজা প্রাণ দিয়েছে, হাজার হাজার মা-বোন ইজ্জত দিয়েছে জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের সেই আদর্শ ও চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি যতদিন টিকে থাকবে ততোদিন পর্যন্ত জনগণ, সরকারের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে 'স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন'।

উপসংহারঃ

"যুদ্ধের সব দুর্যোগ শেষে
স্বাধীনতা দেশ পায়
সবুজের মাঝে সূর্যের লাল
আমাদের পতাকায়।"
(স্বাধীনতা তুমি- জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ)

সুদীর্ঘ ০৯(নয়) মাস মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক। একসাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা এ স্বাধীনতা পেয়েছি। এ স্বাধীনতার পেছনে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা। স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক পরও আমরা তেমন ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। তারপরও সকল ব্যর্থতা ও গ্লানি মুছে ফেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত হয়ে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এটা হোক আমাদের অঙ্গীকার।

দূর্নীতি রুখবো

মোঃ সাহাবউদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ)

দূর্নীতি রূখবো.....
সোনার বাংলাদেশ গড়বো ।
স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত
থাকবে না কোন দূর্নীতিবাজার ।

যারা করবে দূর্নীতির ফন্দি
আইন করবে তাদের শিকলে বন্দি ।
দিবো না কোথাও অবৈধ ঘুষ
নিবো না কোন অন্যায় সুযোগ ।

শস্য শ্যামল এই বাংলাদেশ
থাকবে না-কো দূর্নীতির রেশ ।

রাষ্টীয় সব প্রতিষ্টানে...
সেবা পাবো সবখানে ।
আমরা সবাই হলে শিক্ষিত
জীবন হবে আরো উন্নত ।

কথায়, কাজে হলে প্রতিশ্রুতিশীল
মানুষ হবে আরো দায়িত্বশীল ।
সোনার বাংলার সাবধানে
সমতা আনবো সবার মনে ।

যদি না করি দূর্নীতি আর
উন্নত হবে দেশ ও সমাজ
দূর্নীতি রুখবো...
সোনার বাংলাদেশ গড়বো ।

তাঁত শিল্পের উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকারের অবদান

মোঃ মতিউর রহমান
সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

তাঁত শিল্পের মানোন্নয়নে বিগত ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁতের উন্নয়নে ছিলেন গভীরভাবে আগ্রহী। তাই সে সময় তিনি সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার মাধ্যমে তাঁতিদের ন্যায্য মূল্যে সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব ও নিঃস্ব তাঁতশিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাঁদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহকরণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাঁতিদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) প্রদত্ত গুরুত্বানুসারে ১৯৭৭ সালে ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বাতাঁবো) গঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে Bangladesh Handloom Board Ordinance,1977 রহিত করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। যার

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।

মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুণগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রধান প্রধান কার্যাবলিঃ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জরিপ, শুমারি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদনমূলক সেবা প্রদান; তাঁত শিল্পের জন্য ঋণ সুবিধা সৃষ্টি; তাঁতিগণকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কাঁচামাল ন্যায্যমূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করা; তাঁত পণ্যকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; তাঁতি ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তাঁতজাত দ্রব্যাদির গুণগত মান ও প্রস্তুতকারী দেশ সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপঃ

- বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য রয়েছে। কোন কোন এলাকায় মসলিনের সুতা হতো তা জেনে সে প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের উন্নতি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৯৬ সালের তাঁত শিল্পের ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া শুরু হয়; এটা অব্যাহত রাখতে হবে। তাঁত পণ্য বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- মিরপুরের জমি তাঁত বোর্ডের অফিস ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- মিরপুর ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা। তাই বেনারসি পল্লি ও কর্মরত শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঢাকার বাইরে খোলামেলা জায়গায় বেনারসি/তাঁত পল্লি স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- তাঁতিরা যাতে বিটিএমসি থেকে সুতা পেতে পারে এর ব্যবস্থা করতে হবে।

- সুতা ও রং আমদানির ক্ষেত্রে কিভাবে তাঁতিদের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়া যায় তার প্রস্তাবনা তৈরি করতে হবে।

- ঢাকার মিরপুরের বেনারসি পল্লি ঢাকার বাইরে খোলামেলা পরিবেশে স্থানান্তর করতে হবে। সেখানে তাদের জন্য ঘরবাড়ি, শিশুদের জন্য স্কুল ও কলেজের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জরুরিভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তাঁত শিল্পের উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করেছেনঃ

১। তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি
বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৫০১৫.৬০ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ১৯৯৮ পর্যন্ত। ২০০৬জুন -
প্রকল্প এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ
প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় ঋণ দান কার্যক্রম ঘুর্ণায়মান তহবিল হিসেবে এখনো চলমান আছে।
২। ঈশ্বরদী বেনারসি পল্লি
বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ২০৫.৮৪ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৪ পর্যন্ত।
প্রকল্প এলাকাঃ ঈশ্বরদী, পাবনা।
প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় তাঁতিদেরকে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যেখানে উৎপাদন কার্যক্রম চলমান আছে।

৩। সিলেটের মনিপুরি তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নকশা উন্নয়ন, তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন
বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত।
প্রকল্প এলাকাঃ বিসিক শিল্পনগরী, খাদিমনগর, সিলেট সদর, সিলেট।
প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় সিলেটে ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ০১টি প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বুনন, রংকরণ এবং ফিনিশিং এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং উপজাতীয় তাঁতিদের উৎপাদিত তাঁতবস্ত্র বাজারজাতকরণ সুবিধা চলমান রয়েছে।

৪। রংপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেসিক সেন্টার ও প্রদর্শনী-কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন
বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৪৫৫.৪৯ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত।
প্রকল্প এলাকাঃ গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং আশেপাশের এলাকা, রংপুর সদর, রংপুর।
প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় রংপুরে ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ০১টি প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বুনন, রংকরণ এবং ফিনিশিং এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং প্রকল্প এলাকার তাঁতিদের উৎপাদিত তাঁতবস্ত্র বাজারজাতকরণ সুবিধা চলমান রয়েছে।

৫। তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন প্রকল্পঃ
প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৩৮০৯.৮৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীতে ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ; কালিহাতি, টাঙ্গাইল এবং কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজারে ১টি করে মোট ৩টি ফ্যাশন ডিজাইন সাব সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ৪টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র হতে বছরে ২৪০০ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রতি বছর ৫০ জনকে ৪বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ফ্যাশন ডিজাইন ডিগ্রি প্রদান করা হবে।

৬। ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন (বিএমআরই) অব দ্যা এক্সিসটিং ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার এ্যাট মাধবদী, নরসিংদী (২য় সংশোধিত):
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৩ –জুন ২০১৯।
বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৪৪৫৯.২২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হলে প্রকল্প এলাকা এবং আশে পাশের প্রায় ১.০০ লক্ষ তাঁতি বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবে। কেন্দ্রের বর্তমান বাৎসরিক সার্ভিসিং ক্যাপাসিটি ৩.৬৮ কোটি মিটার দাঁড়াবে। কাপড় উৎপাদনের ত্রুটির হার হ্রাস পাবে এবং গুণগতমান সম্পন্ন কাপড় উৎপাদিত হবে।

৭। এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া প্রকল্প:

প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৮৮৮০.০০ লক্ষ টাকা ।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালঃ জুলাই ২০১৯ জুন ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ (১)কালিহাতি, টাঙ্গাইল, (২)শাহজাদপুর , সিরাজগঞ্জ, (৩) কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমনকাপড় রংকরণ , মার্সারাইজিং, সাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্টারিং, ফোল্ডিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৩টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা; প্রকল্প এলাকার প্রায় ১লাখ হস্তচালিত তাঁতে নিয়োজিত তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা ৪০. দান করাপ্র; তাঁতিদেরকে উন্নত ও মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা করা।

ফলাফলসুবিধাভোগীঃ/

৩টি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার হতে বছরে প্রকল্প এলাকার প্রায় ১লাখ হস্তচালিত তাঁতে নিয়োজিত তাঁতিদের ৪০. বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান করা হবে।

৮। বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য এর 'মসলিন' সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়):

প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১২১০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালঃ জুলাই ২০১৮ জুন ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে মসলিনের সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি বের করা।
- পরীক্ষামূলকভাবে মসলিনের সুতা ও কাপড় তৈরি করা।
- "বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য" মসলিন এর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, পার্বত্য জেলাসমূহ, কুমিল্লা, রাজশাহী এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য জেলা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

৯। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ০৫টি বেসিক সেন্টারে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ১ , র্কেট প্রমোশন কেন্দ্রটি মা২ইনস্টিটিউট এবং স্থাপনঃ

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১৭০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১।

প্রকল্প এলাকাঃ আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ; টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল; সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ; কাহালু, বগুড়া; কুমারখালী, কুষ্টিয়া; মেলান্দহ, জামালপুর; কারওয়ান বাজার,ঢাকা।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ দেশে মধ্যম পর্যায়ের বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরি এবং তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; ভোক্তার রূচি ও পছন্দ এবং পরিবর্তিত বাজার চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন ; প্রান্তিক তাঁতিদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সর্বোপরিতাঁতিদের , জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রতি বছরে ১৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট হতে প্রতি বছর ৫০ জনকে ফ্যাশন ডিজাইনের ডিপ্লোমা ডিগ্রিজনকে সার্টিফিকেট কোর্স ২৪০ , জনকে শর্ট কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ১৫০প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তাবিত এ ২টি মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপিত হলে দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতিদের ন্যায্য মূল্যে তাদের উৎপাদিত তাঁত বস্ত্র বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১০। শেখ হাসিনা তাঁত পল্লি স্থাপন-১ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৩০৭৪৫.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালঃ জুলাই ২০১৮ -জুন ২০২২ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ শিবচর, মাদারীপুর এবং জাজিরা, শরিয়তপুর।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ উন্নত পরিবেশে তাঁতি এবং তাঁতি পরিবারের জন্য বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, তাঁতিদের জীবনযাত্রার মান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাঁত শিল্পের টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুবিধা ভোগীঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ তাঁতি পরিবারের পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রত্যেককে আবাসকারখানা স্থাপন [কাম] .১২০এবং অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ০০ একর জমি অধিগ্রহণের করা হবে। তাঁতিদের মাঝে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়াকারিগরি সেবা ও ,পাদন উপকরণ সরবরাহে সহায়তা দানপ্রয়োজনীয় উৎ , সুবিধাদি প্রদান প্রভৃতিসম্প্রসারণমূলক কার্য পরিচালনা করা হবে। এতে তাঁতিদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাঁদের দারিদ্র্য বিমোচনসহ জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

১১। বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটনরসিংদী , এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণঃ

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৬০১৫.০০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১।

প্রকল্প এলাকাঃ নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

১২। দেশের তাঁতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ, অচালু তাঁত চালু করা এবং তাঁতের আধুনিকায়নঃ

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত। ২০২৩জুন -
প্রকল্প এলাকাঃ পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন ৩০ টি বেসিক সেন্টারের ভৌগোলিক এলাকা।

আউটপুটঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ৩৪৬৫০ টি তাঁতের অনুকূলে তাঁতিদের মাঝে ঋণ বিতরণ সম্ভব হবে , ১৫০০ টি তাঁতকে আধুনিকায়ন করা হবে; বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১৩। শেখ হাসিনা নকশি পল্লি, জামালপুর (১ম পর্যায়):
প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৭২২০০ লক্ষ টাকা। ০০.
প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ মার্চ ২০১৯. ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

আউটপুটঃ বর্তমানে উৎপাদিত নকশি পণ্য ১০ লাখ পিছ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০ লাখ পিছে উন্নীত হবে। বর্তমানে উদ্যোক্তার সংখ্যা ৩৭৬ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০০ জনে উন্নীত হবে। বর্তমান কর্মসংস্থান ৩ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪ লক্ষে উপনীত হবে। প্রশিক্ষিত কর্মী ৩ লক্ষ হতে ৪ লক্ষ হবে।

অনুমোদনের অপেক্ষাধীন প্রকল্পসমূহঃ

১। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা।
বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ২১৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ।
প্রকল্প এলাকাঃ মিরপুর, ঢাকা।

২। বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর, জামদানি শিল্পের উন্নয়নে প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন
বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১৯৯৪০.০০ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩
প্রকল্প এলাকাঃ তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

৩। ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৮৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ
প্রকল্প এলাকাঃ পাথরাইলটাঙ্গাইল। ,দেলদুয়ার ,

৪। তাঁতজাত পণ্যের বহমুখীকরণঃ
বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকালঃ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ)
প্রকল্প এলাকাঃ তারাবো ,সিরাজগঞ্জ এবং নওগাঁ ,উল্লাপাড়া ও বেলকুচি ;টাঙ্গাইল ,দেলদুয়ার ;নারায়ণগঞ্জ ,রূপগঞ্জ , রাজশাহী।

৫। গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় হোসিয়ারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২২)

প্রকল্প এলাকাঃ গোবিন্দগঞ্জগাইবান্ধা। ,

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচিঃ

বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০১৯ ২০২২ডিসেম্বর -

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১২০০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি।

৭। জামদানী ভিলেজ স্থাপনঃ

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৪৮৫০.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নকালঃ (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ)

প্রকল্প এলাকাঃ তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়গনঞ্জ।

বর্ণিত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও বর্তমান সরকারের সময়ে তাঁতশিল্পে অর্জিত অন্যান্য সাফল্যসমূহঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটে শুল্কমুক্তভাবে (৫% এর অধিক) সুতা, রং ও রাসায়নিক আমদানির বিষয়টি মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সে অনুযায়ী ৪ জুন, ২০১৫ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এসআরও জারি করা হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক বিটিএমসি এর মিলসমূহে উৎপাদিত সুতা নির্ধারিত মূল্যে মিল গেট হতে সরাসারি তাঁতিদের নিকট বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৪৪,৭৪০ জন তাঁতিকে ৬৬,৯১৬টি তাঁতের অনুকূলে ৭৭১৭.৮২ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে এ পর্যন্ত মোট ১৪,৫৩৫ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী হতে ৩২১ জনকে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সার্ভিস সেন্টারসমূহ হতে বয়নপূর্ব সেবা (টুইষ্টিং) এর মাধ্যমে ৩,০৬,১২৫ কেজি সুতা উৎপাদন করা হয়েছে এবং বয়নোত্তর সেবা (ক্যালেন্ডারিং) এর মাধ্যমে ৬৬১২.০২ লক্ষ মিটার কাপড়ে প্রক্রিয়াকরণ সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষকের ন্যায় তাঁতিদেরকেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে ১০.০০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

- ২২ বছর যাবত অবৈধ দখলে থাকা মিরপুরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ৪০.০০ একর জমির মধ্যে ৩.০০ একর জমি গত ১৯-০৮-২০১৫ তারিখে এবং ৩৭.০০ একর জমির রেজিষ্ট্রেশন গত ১০-০৭-২০১৮ তরিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের সংখ্যা ০২টি হতে ০৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে।
- তাঁত বোর্ডের সার্ভিস সেন্টারসমূহের তাঁত বস্ত্র সার্ভিস প্রদানের সক্ষমতা ৪ কোটি মিটার হতে ৪২.৩২ কোটি মিটার কাপড়ে উন্নীতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৩৬৬০টি 'কান্ট্রি-অব-অরিজিন' সনদ প্রদানের মাধ্যমে ১১,১৪,৭৪,৪৯৫.৩৮ মার্কিন ডলার মূল্যমানের রপ্তানি আয় হয়েছে।
- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চলমান ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ই-সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে এটুআই এর সহযোগিতায় "e-loan management system for the weavers" শীর্ষক ই-সার্ভিসটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের বিগত ১৬ বছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সর্বমোট ব্যয় ১,৫৫,৭৪৮.৭০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে অন্যান্য সরকারের সময়ে ২৫ বছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সর্বমোট ব্যয় ৬৫ কোটি ৪২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাঁতিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে। উৎপাদিত তাঁত বস্ত্র দেশের বর্তমান অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার শতকরা ২৮ ভাগ হতে ৫০ ভাগে পূরণ করতে সক্ষম হবে। তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে, দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত বস্ত্রের অবদান বৃদ্ধি পাবে। ফলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিজয়ের দিনে নতুন বিজয়

মেহেরী আফসানা
পরিসংখ্যানবিদ

আজ মতিন সাহেবের মনটা খুব খারাপ। সাধারণত সন্ধ্যার এই সময়টাতে তিনি একটু হাঁটাহাঁটি করলেও আজ ব্যালকনিতে বসে আলোছায়ার রহস্যময় মেলবন্ধন দেখছেন। দূরের মিটিমিটি আলোগুলো কাছে আসতে আসতে কতো সহজেই আঁধারে মিলিয়ে যায়। মানুষের তৈরী স্বপ্নগুলোও এইভাবে মিলিয়ে যায় সময়ের ঘূর্ণিপাকে। তিনিও তার স্বপ্ন ভাঙনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। "দাদাজান চা খাইবেন?" পরীর ডাকে সম্বিৎ ফিরলো তার। উত্তর না দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, " তোর ব্যাগে সব নিয়েছিস তো?"

- আমার আর কী আছে। দুইডা জামা একলগে পইরা লইলে আর ব্যাগও নেওন লাগতোনা। হিহি..

- পরীর কথা শুনে মতিন সাহেবও হেসে ফেললেন। তারপর মেয়েটার গালের আচঁড়ের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন তিনি। তীব্র অপরাধবোধ গ্রাস করলো তাকে। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে তিনি বললেন, "আলমারি থেকে তোর দাদীর আয়নাটা নামিয়ে ব্যাগে ভরে নে।"

পরী বললো, " কী কইতাছেন দাদাজান! বাড়িত আয়না লইয়া যায়া কী করুম! "

"তোর এত ভাবতে হবেনা, যা বলছি কর। আর তারপর যেয়ে ব্যাগ গুছিয়ে নে। " মতিন সাহেবের কথা শুনে আর কথা বাড়ায়না পরী।

রাতের বেলা খাবার টেবিলে বসে প্রতিদিনের মতো আজও ছেলে আর ছেলের বউ মিলে তার নাতিকে শেখাচ্ছে কীভাবে ইংরেজিতে খাবার চাইতে হয়, কীভাবে খেলে মানুষ গেঁয়ো ভাববে এইসব। ছেলে শফিক আর তার বউ রিমি দুইজনই উচ্চশিক্ষিত। নাতিও একটা নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। খাবার টেবিল থেকে শুরু করে ঘুমানো পর্যন্ত সবকিছুতেই তাই সেই শিক্ষার ছাপ রাখতে তারা সদা ব্যস্ত! বাংলায় কথা বলাটা ওদের কাছে অসম্মানজনক।

মতিন সাহেব খেতে খেতেই খুব স্বাভাবিক ভাবে বললেন, "আমি আগামীকাল গ্রামের বাড়ি চলে যাচ্ছি।" তারপর তার ছেলে আর ছেলের বউ এর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন, " বলতে পারো এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর হ্যাঁ, পরীকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। ও আর তোমাদের সাথে থাকবেনা। তোমাদের দরকার হলে অন্য কাউকে খুঁজে নিয়ো। "

শফিক উঁচু স্বরে কিছু বলতে নিলে হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে দেন তিনি। তারপর খুব শান্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করেন, " নিজের বাড়ি কেউ শখ করে ছেড়ে যায়না নিশ্চই। নিজের গড়ে তোলা বাড়ি-ঘর, সংসার, সন্তান নিয়ে থাকাই তো মানুষের স্বপ্ন থাকে। আমি আমার সেই স্বপ্ন ছেড়ে যাচ্ছি। কারণ জানতে চাও? তবে শোনো, আমার স্বপ্নগুলো দুঃস্বপ্ন হয়ে গিয়েছে। তোমাদের শিক্ষিত বানাতে যেয়ে কখন যে অমানুষ বানিয়ে ফেলেছি তা নিজেও বুঝতে পারিনি। আমারও সময় শেষ। যে কয়দিন বাঁচবো একটু শান্তি নিয়ে বাঁচতে চাই। এখানে থেকে রোজ নিজের স্বপ্নের অপমৃত্যু আর সহ্য করতে পারছিনা আমি।

রিমি বললো, " আপনি কীসব বলছেন বাবা! আপনাকে তো কোন অসম্মান করিনি কখনও! আর আপনি রায়ানের কথাটা একবার ভাবলেন না!"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মতিন সাহেব বলতে শুরু করেন, "আমাকে অসম্মান করলেও সেটা মেনে নিতে বোধহয় আমার কম কষ্ট হতো। পরীর মতো একটা বাচ্চা মেয়ের প্রতি তোমাদের প্রতিনিয়ত যে আক্রোশ দেখি তাতে মনে হয় অচল, অক্ষম হলে আমার ভ্যাগ্যেও বোধহয় এর চেয়ে ভালো কিছু জুটতোনা। একটা বাচ্চা মেয়েকে ছোট অপরাধে অথবা বিনা অপরাধে এমন নির্যাতন করার পর তোমাদের মুখে রায়ানের চিন্তার কথা স্বাভাবিক শোনায় না। কোন বাবা মা অন্যের সন্তানকে এমন ভাবে নির্যাতন করতে পারেনা। তোমার সন্তানের থেকে কতটুকুই বা বড়ো ও! সারাদিন হেন কোন কাজ নেই যা ওকে দিয়ে করানো হয় না। তোমার ছেলের সাথে কথা বলতে গেলে ওরও তোমাদের মতো করে কথা বলতে হবে! ওকে কোন শিক্ষায় শিক্ষিত করেছো যে ওর কাছে আশা করো তোমাদের মতো হবে? নিজের ভাষায় কথা বলার জন্য একটা বাচ্চা মেয়ের এইভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হবে জানলে বোধহয় ভাষা আন্দোলনও হতোনা, আর অন্য সংস্কৃতিকে আঁকড়ে

ধরে বাঁচার হলে মুক্তিযুদ্ধেরও প্রয়োজন হতো না। যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিলো মাত্র ষোল বছর। কতটুকুই বা বুঝি! কিন্তু এইটুকু ঠিকই বুঝতাম, যে মানুষগুলো নির্যাতিত হচ্ছে তাদের নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকা। শুধু নিজের কথা ভাবলে আমরা কেউ যুদ্ধে যেতামনা। স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা, যে দেশে নিজের ভাষায় কথা বলতে বাঁধা থাকবেনা, যে দেশে অন্যের গোলাম হয়ে থাকতে হবেনা, ভেদাভেদ ভুলে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবো এমন একটা শান্তির আশায় ছুটেছিলাম আমরা।

কিন্তু আমার নিজের ঘরে গ্রাম্য ভাষায় কথা বলার অপরাধে একটা শিশুকে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করা হয়। আমার নিজের নাতিকে শেখানো হয় বাংলায় কথা বলা লজ্জার ব্যাপার! তোমাদের তথাকথিত নিচুশ্রেণির মানুষদের সাথে মিশতে পারবে না। ছিহ! লজ্জা হয় আমার। আজ যার জন্য আমি বেঁচে আছি আমার সেই সহযোদ্ধা ছিলো একজন দিনমজুর। নিজের জীবন বাজি রেখে আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলো সে। বলতে গেলে আমি আজ তার জন্যই বেঁচে আছি। তোমাদের সাথে সেই হিসেবে আমিও বেমানান। ধনীর ঘরে জন্মেছিলাম বলে পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ হয়েছিলো। নইলে আমি কী হতাম আর আমার সন্তানই বা কী হতো তার নিশ্চয়তা ছিলো?

তোমাদের শিক্ষায় মানুষের সাথে দুরত্ব রেখে চলাটা স্ট্যাটাস। অন্যকে ছোট করতে পারলেই নিজে বড় হওয়া যায়! নিজের ছেলেকে কী শিক্ষা দিচ্ছো ভেবে দেখেছো কখনও! বড় হলে ওর কাছে যেন আবার তোমরাই অযাচিত না হয়ে যাও! দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা শেখানোর বদলে যে শিক্ষা দিয়ে বড় করছো তাতে আর যাই হোক ভালো মানুষ কখনও হয়ে উঠবেনা।

যাই হোক, পরীকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বাড়িতে চলে যাবো আমি। শেষ কয়েকটা দিন সেখানেই থাকার ইচ্ছে। অন্তত জীবনের শেষ দিনগুলোতে দেখে যেতে চাই, যে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম সে দেশের মানুষগুলো নিজের ভাষায় কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ করছেনা, নিজের দেশের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকতে কোন দ্বিধায় ভুগছেনা! আমি কাল সকালেই চলে যাবো। যদি কোন প্রয়োজন হয় জানাবে। কথাগুলো শেষ করে উঠতে উঠতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মায়ের একটা খুব প্রিয় আয়না ছিলো। পরীরও সেটা খুব পছন্দের। এই বাড়িতে থেকে ও তোমাদের নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর তো কিছু পায়নি। তাই ওই আয়নাটা আমি ওকে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর ঘুরে এসে নাতিকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন, "আমার দোয়া সবসময় তোমার সাথে থাকবে। মানুষের মতো মানুষ হউ দাদুভাই।"

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রুমে ঢুকে গেলেন তিনি। শত প্রতিকূলতায়ও কখনও নিজের ভেঙে পড়া চেহারাটা কাউকে দেখাতে চাননি তিনি। আজও তাই চাননা কারো সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হোক। স্মৃতিবিজড়িত ঘরটার চারিদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। হয়তো এটাই শেষবার!!

সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ অনেকটাই দেরি হয়ে গেলো তার। উঠে যেয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন তিনি। লাল সবুজ পতাকায় সাজানো বাড়ির সামনের অংশটা। দ্রুত বের হয়ে বাইরে গেলেন তিনি। বের হতেই দেখলেন রিমি আর পরী মিলে শফিককে পতাকা টাঙানোতে সাহায্য করছে। তাকে দেখেই একটা পতাকা হাতে নিয়ে রায়ান এসে সুন্দর বাংলায় বললো, "বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা দাদাজান"।

শফিক আর মিলি কাজ বন্ধ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শফিক বললো, "আমাদের ক্ষমা করে দিন আব্বু। এভাবে ছেঁড়ে যাবেননা। "

পরীর হাতটা ধরে রিমি বললো, " পরীকে আমি আমার মেয়ের মতো করেই দেখে রাখবো। আমাদের একটা সুযোগ দিন বাবা। "

বিজয়ের আনন্দে অশ্রুসিক্ত হচ্ছে চোখ। চোখের পানি গোপন করতে রায়ানকে নিয়ে বললেন চল দাদাভাই, ছাদে পতাকা দিয়ে আসি। লাল সবুজ পতাকা হাতে নিয়ে তিনি শিহরণ অনুভব করলেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রায়ান বলে চলেছে, "বাংলাদেশ আমার অহংকার। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি।" পেছনে পরীর হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মতিন সাহেবের আজ আনন্দের দিন। বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করছেন তিনি। ছাদে উঠে পতাকার দিকে তাকিয়ে একটা স্যালুট দিলেন তিনি। পেছনে তাকালে দেখতে পারতেন,তার সাথে আরও চারটা হাত স্যালুট জানাতে উঠে গেছে উপরে।

পুনর্জন্ম

মো: মেহেদী হাসান
সহকারী মহাব্যবস্থাপক(দায়িত্বপ্রাপ্ত)
এসএফসি, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

কত শতাব্দি ধরে লাখো-কোটি জনতার মাঝে
ক্ষুদ্র এ দেশে তোমার পদধ্বনি
আজো বহমান।

তোমার বার্তা আকাশে, বাতাসে, মেঘে, সুবাসে শান্তিতে
চির অম্লান।

জড়িয়ে আছো তুমি বিশাল এ বঙ্গে,
তোমার দেখানো পথে হেঁটে যাচ্ছে সকলে
তুমি অনেক উঁচুতে।

আবার এসো এ বঙ্গের কান্ডারিরূপে
হিংস্রতা, দুর্নীতি সন্ত্রাস দিও রুখে,
বুঝিয়ে দাও, সততাই সব
অভিশাপমুক্ত করে দিও
বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ সন্তান,
প্রিয় জাতির পিতা-হে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তোমার আদেশ থাকুক বহমান
এ দেশের সতের কোটি জনতার
সেটাই আহ্বান।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ

মোঃ গোলাম রব্বানী
মার্কেটিং অনুবিভাগ
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে ঘৃন্য সেনা অভিযানের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুকে তার ধানমন্ডির বাসবভন থেকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্থানি হানাদার বাহিনী। গ্রেপ্তারের আগেই ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং যেকোন মূল্যে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফুর রহমান এবং তাঁর দাদার নাম শেখ আবদুল হামিদ। তাঁর মাতার নাম সাহেরা খাতুন এবং নানার নাম আবদুল মজিদ। তাঁর আকিকার সময় তাঁর নানা আবদুল মজিদ বঙ্গবন্ধুর নাম রেখেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং বলেছিলেন এ নাম একদিন জগৎ জোড়া খ্যাত হবে। পিতা মাতা তাকে আদর করে খোকা' বলে ডাকতেন। ভাইবোন ও গ্রামবাসির নিকট তিনি 'মিয়াভাই' বলে পরিচিত ছিলেন। 'কৈশরেই তিনি খুব অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জে সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর শেখ মুজিব তাঁর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।'

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া সেই ছেলেটি, কালের পরিক্রমায় হয়ে ওঠেন বাঙ্গালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় মুজিব তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে ১৯৩৮ সালে প্রথমবারের মতো কারাবরণ করেন। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকসহ তৎকালীন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন অসাম্প্রদায়িতক চেতনায় বিশ্বাসী এই নেতা।

১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙ্গালি জাতি অভিভাবকহীন হয়ে পরলে শেখ মুজিবুর রহমান তার দিপ্ত মেধা দিয়ে আগলে রেখেছিলেন বাঙালি জাতিকে। দিয়েছিলেন মুক্তির ডাক। গড়েছেন সোনার বাংলা নামক একটি প্রান্তর, আর মায়ায় ভরা মানুষের জাতি, বাঙালি জাতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বঙ্গবন্ধু প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করেই বাংলা ও বাঙালিকে পদানত করে রাখার জন্য প্রথমেই আঘাত হানে ভাষার ওপর। তারা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত করেন। ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু জেলে থাকাকালীন অবস্থায় ভাষার জন্য অণশন শুরু করেন। পরবর্তীতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি আবার আন্দোলন শুরু করনে। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রেস কনফারেন্স বলেন "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, রাজবন্দিদের মুক্তি

দিতে হবে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং যারা অন্যায়ভাবে জুলুম করেছে তাদের শাস্তি দিতে হবে।" ভাষার জন্য শুরু হল আন্দোলন। আমার পেলাম মায়ের ভাষা "বাংলা"। আজ ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটে তার। তারপর নিজের রাস্তা নিজেই তৈরি করে নিয়েছেন। নিজেকে পরিণত করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে বঙ্গবন্ধু ছিলেন জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং ১৯৫৩ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক নিযুক্ত হন। পকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিমলীগ পকেট সংগঠনে পরিণত হলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে শেরেবাংলা, ভাষানী ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর চারটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নৌকা প্রতিক নিয়ে যুক্তফ্রন্ট বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয় এবং প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির চারদিন পর বঙ্গবন্ধুকে নিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়। প্রায় ১৪ মাস আটক রাখার পর মুক্তি পান তিনি। তবে আবার জেলগেট থেকে তাঁকে আটক করা হয়। প্রায় দুই বছর করাগারে থাকেন এসময়। ১৯৬১ সালে হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি মুক্তিপান। ১৯৬২ সালে জননিরাপত্তা আইনে আবার তাঁকে গ্রফতার করা হয়। পরবর্তীতে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন প্রকাশিত হলে বঙ্গবন্ধু এর সমালোচনা করেন এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। বঙ্গবন্ধু সারা জীবনে মোট ৪৬৮২ দিন কারা ভোগ করেন। এর মধ্যে ব্রিটিশ আমলে ৭ দিন এবং পাকিস্তান আমলে ৪৬৭৫ দিন।

তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোচ্চার হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৬৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ছয় দফাকে দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে, ওই ছয় দফার পক্ষে জনমত সংগঠিত করতে দেশব্যাপী একের পর এক জনসভা করেন। এরই অংশ হিসেবে ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এক জনসভায় তিনি ছয় দফাকে 'নূতন দিগন্তের নূতন মুক্তিসনদ অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'একদিন ব্রিটিশ সরকারের জবরদস্তি শাসনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে এই চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়েই বীর চট্টলার বীর সন্তানরা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। আমি চাই যে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের জন্য দাবি আদায়ের সংগ্রামী পতাকাও চট্টগ্রামবাসী চট্টগ্রামেই প্রথম উড্ডীন করুন। এরপর একে একে ২৭ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীর মাইজদি ও বেগমগঞ্জ, ১০ মার্চ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, ১১ মার্চ ময়মনসিংহ সদর এবং ১৪ মার্চ সিলেটে তিনি জনগনের সামনে ছয় দফা তুলে ধরেন। আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা কর্মসূচি শীর্ষক একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ২০ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি বলেন, 'কোনো হমকিই ছয় দফা আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। ছয় দফা হচ্ছে বাঙালির মুক্তিসনদ।'

ছয় দফা ঠেকাতে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বহু ষড়যন্ত্র করেছে। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'বলে খ্যাত 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য মামলা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির কাষ্ঠেও ঝুলাতে চেয়েছিল শাসকেরা। তবু তিনি অনড় থেকেছেন; বিন্দুমাত্র আপস করেননি। ফিরে এসেছেন জনতার কাতারে। 'শেখ মুজিব' থেকে হয়ে উঠেছেন 'বঙ্গবন্ধু'।

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সম্মেলনে শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে তৎকালীন ছাত্র নেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল প্রকাশিত নিউজউইক ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে "Poet of Politics" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭১ সালের ৩মার্চ আ স ম আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামীলীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন,"জনগনের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্বপাকিস্তানের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' হবে"।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও পাকিস্তনি সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। উল্টো আঁকতে থাকে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আপসহীন নেতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো বাঙ্গালির সমাবেশে ঘোষণা করেন," এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...। এ শুধু ঘোষণা মাত্র নয়, এ যেন কোনো এক কবির অনবদ্য কবিতা। অধিকার বঞ্চিত দিশেহারা মানবতার মুক্তির সনদ। ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এক গণভাষণ। মুক্তিপাগল বাঙালি জাতিকে যা এনে দিয়েছিলো চিরআকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বাদ। সেদিন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এ ভাষণ। তারই ধারাবাহিকতায় ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা চালায়। ইতিহাসের বাঁক বদলে দেওয়া এক বজ্রকণ্ঠ সেদিন আমাদের জাগিয়ে দিয়েছিল। বাঙালি জাতির মনে গেঁথে দিয়েছিলো স্বাধিকারের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বোনার মধ্য দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছিলেন এ ভূখণ্ডের আশা আকাঙ্খার প্রতীক। ঐতিহাসিক সেই ভাষণে তিনি বাঙালিদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকারও আহ্বান জানান।

২৫ মার্চ কালরাতে ঘৃণ্য সেনা অভিযানের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুকে তার ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। গ্রেপ্তারের আগেই, ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং যেকোনো মূল্যে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার সেই ঘোষণা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় দেশে-বিদেশে।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার ভবেরপাড়া গ্রামের আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১, দেশ বিদেশের ১২৭ জন সাংবাদিকের সামনে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তবে বঙ্গবন্ধু জেলে থাকার কারনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দ্বায়িত্ব পালন করেন। মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজ উদ্দিন আহমদ। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্তে মুজিব নগর সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করে। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধু কারাবন্দি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। যেকোনো মুহূর্তেই তাকে মেরে ফেলা হবে এমন আশঙ্কায় ছিল পুরো জাতি; তবু তিনি পরোয়া করেননি। তার প্রেরণা, তার নির্দেশনা মেনে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ৯৩ হাজার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী

রেসকোর্সের ময়দানে আত্মসমর্পন করে। প্রতিষ্ঠিত হয় জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ। আর এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গপন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৯ (নয়)মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াই শেষে শেষ হাসি হেসেছিল বীর বাঙালি। আমরা পেলাম সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশ ও জাতির জন্য এক দুর্ভাগ্য অধ্যায়। তবে সবকিছু পেছনে ফেলে উন্নয়নশীল

দেশের স্বীকৃতি নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন, ভেক্সিন হিরো, মাদার অব দা হিউমিনিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। উন্নয়নের মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ। স্যাটেলাইট মহাকাশে। উন্নতির পথে মানুষের মৌলিক চাহিদা গুলো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দেওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার "স্বাধীনতা"র কারনেই আজ আমরা বিশ্ব দরবারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পাচ্ছি। তাই নির্দ্বিধায় আমরা প্রায় আঠারো কোটি বাঙ্গালি তথা সারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ সমস্বরে বলতে পারি "বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা মানে বঙ্গবন্ধ"।

বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মুক্তির মহানায়ক, বাঙালি জাতির জনক, বাংলাদেশের স্থপতি, স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বর্ষ ২০২০ সালকে তাই ঘোষণা করা হয়েছে মুজিববর্ষ হিসেবে। পরিশেষে উপরোক্ত ধারাবাহিকতায় আমরা বলতে পারি

"বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ"।

স্বাধীনতা, বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, উচ্চমান সহকারী

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ ধ্বংসস্তুপ হয়ে পড়ে। বাঙ্গালীদের জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা বর্গ এবং দেশপ্রেমিক নাগরিকের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর চিত্রটি ছিল খুবই কষ্টের। চারিদিকে ছিল কান্না, স্বজন হারানোর বেদনা, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দরের বেহাল অবস্থা ছিল। সেই সাথে রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল অর্থশূন্য। সেই সময় মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করাই ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে।

৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন দুই দিন পরে ১০ জানুয়ারি। উপস্থিত জনতার ঢলে ভেসে যাচ্ছিল বিমানবন্দর। বিশাল জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন বঙ্গবন্ধু, নাতিদীর্ঘ ভাষণে জাতিকে দেন মূল্যবান দিক নির্দেশনা।

বঙ্গবন্ধু সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে দেখলেন গুদামে খাদ্য নেই, মাঠে ফসল নেই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ শূন্য, রাস্তার বেহাল দশা, সড়ক ও রেলপথ বিচ্ছিন্ন, নৌ ও সমুদ্রবন্দরগুলো বিধ্বস্ত। স্কুল-কলেজগুলো ছিল পরিত্যক্ত। সেই অবস্থা থেকে আজ আমরা যেই বাংলাদেশকে দেখছি তাঁর মূল খুঁটিটি তৈরি করে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

একটি সুন্দর বাংলাদেশ গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধু একে একে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেন- স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে অস্থায়ীভাবে সংবিধান প্রণয়ন করেন। সংবিধানকে চূড়ান্তরূপ দান করার জন্য গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। যা ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর বিল আকারে গণপরিষদে পেশ করা হয় এবং পরবর্তীতে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

ধ্বংসযজ্ঞের পর বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তা পালন করা সহজ ছিল না। এই কঠিন কাজটি সফল করার জন্য গণপরিষদ আইন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন-

- দেড় কোটি শরণার্থী আরো প্রায় এক কোটি অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষকে খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা;
- প্রতিটি পরিবারকে কম করে হলেও একটা টিনের শেড, প্রতি মাসে আধা মণ থেকে দেড় মণ পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ;
- চাষাবাদের নানা উপকরণ, ক্যাশ টাকা, নিত্যপ্রয়োজনীয় সব দ্রব্য সরবরাহ;
- খাদ্য উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি ভর্তুকি প্রদান;
- ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা;
- উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন;
- পাটশিল্প, শিপইয়ার্ড ও ডিজেল প্লান্ট ইত্যাদির পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ এর জন্য কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতি জোগানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেন ৫৭৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা।

এছাড়া আরও নানা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে আসেন। এসকল কিছুই করেছিলেন তিনি দেশের সাধারণ জনগনের জন্য। সদ্য স্বাধীন দেশ, দেশের মানুষ, দেশের উন্নয়নের জন্য তিনি সদা নিয়জিত প্রাণ ছিলেন।

এ জন্যই স্বাধীনতা, বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু এক সুতই গাঁথা। আমরা আমাদের এ দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে স্বাধীন করার অগ্রাণী ভূমিকা পালন, দেশের উন্নয়ন এবং দেশের মানুষের উন্নয়নের এ মহানায়কের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। এ জন্য বঙ্গবন্ধুর তুলনা শুধুই বঙ্গবন্ধু। পরিশেষে আমরা এ মহান মানবের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধু

মোঃ সাদমান সাকিব(লিয়ন)
পিতাঃ মোঃ গোলাম রব্বানী
তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল।

চোখের কালিতে মনের খাতায়
লিখে দিলাম একটি নাম
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

আকাশের নীলে সাগরের জলে
এঁকে দিলাম একটি নাম
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

ফুল পাখিদের কলগানে
কাননে মধূপ গুঞ্জরণে
গেয়ে যায় একটি নাম
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

নদীর স্রোত ঝরনা ধারায়
ছন্দ ছড়ায় অস্ফুট বেদনায়
ধ্বনিত হয় একটি নাম
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

তোমার ছবি

মোঃ সাদমান সাকিব(লিয়ন)
পিতাঃ মোঃ গোলাম রব্বানী
তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল।

মাটির মানুষ শেখ মুজিবুর
কোথায় তুমি নেই
তোমার ছবি টাঙানো আছে
দেশজুড়ে সবখানেই।

পাখির কাছে গাছের কাছে
রুপোলি সব মাছের কাছে
বাংলাদেশের নদীর কাছে
তোমার একটা ছবি আছে।

তারার কাছে চাঁদের কাছে
রোদের আলোর বাঁধের কাছে
বাংলাদেশের কবির কাছে
তোমার একটা ছবি আছে।

সোনালি ধানক্ষেতের ওপর
ঢেউ খেলে যায় যখন
দিগন্তরে মুজিব তোমার
ছবি দেখি তখন।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

মোঃ সাদমান সাকিব(লিয়ন)
পিতাঃ মোঃ গোলাম রব্বানী
তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল।

আমরা শিশু, আমরা কিশোর
সাজিয়েছি ফুলের আসর
তোমায় বরণ করবো বলে
হৃদয় মাঝে সিক্ত করে আঁখিজলে।

সবুজ দেশের অবুঝ মোরা
দেখি একটি মুখ মায়ায় ভরা
মুখের হাসি মোদের মতো
তাইতো তুমি আপন এতো।

আজকে তোমার জন্মদিনে
আমরা তোমার আপনজনে
তোমার গলা জড়িয়ে ধরি
ফুলের মালায় বরণ করি।

তোমার গড়া বাংলাদেশে
আমরা সবাই মিলেমিশে
সোনার বাংলা গড়বো
স্বপ্ন তোমার সফল মোরা করবো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ

মো: বিল্লাল হোসাইন
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
'৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প।

ভূমিকা:
স্বাধীনতা হলো একটি রাষ্ট্রের আজন্ম লালিত স্বপ্ন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হওয়ার মধ্যে যেমন গৌরব থাকে তেমনি পরাধীনতায় থাকে গ্লানি। আর তাই পরাধীন হয়ে কেউ বাঁচতে চায় না। দাসত্বের শৃঙ্খলেও কেউ বাঁধা পড়তে চায় না। বাঙালি জাতিও চায়নি বছরের পর বছর ধরে শাসনে-শোষণে পাকিস্তানিদের দাস হয়ে থাকতে। তাই তারা শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল আন্দোলনে, সোচ্চার হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে বীর বাঙালি ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতাকে। ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, লাখো বীরাঙ্গনার সমগ্র হারানোর বিনিময়ে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয়েছে এ দেশের স্বাধীনতা। মুক্তিকামী মানুষ হারিয়েছে তার সর্বস্ব। কিন্তু সব হারিয়েও তারা অর্জন করেছে স্বাধীন সার্বভৌম স্বপ্নের একটি দেশ-বাংলাদেশ।

প্রেক্ষাপট:
১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বাঙালি জাতি কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র পায়নি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানির কখনোই পূর্ব পাকিস্তানকে সমমর্যাদা দেয়নি। বরং সব সময়ই চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানকে দমিয়ে রাখতে। এ যেন রাষ্ট্রের ভেতরে আর এক গোলামী রাষ্ট্র। পশ্চিম পাকিস্তানির সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত করতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানকে। পণ্যের কাঁচামাল, উৎপাদন, আয়, রপ্তানি আয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বেশি হলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় হতো খুবই সামান্য। দেশের মোট ব্যয়ের সিংহ ভাগই ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় যেখানে ৯৫% ব্যয় হত সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় ব্যয় হত ৫ শতাংশ। ১৯৭০'র নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হলেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কোনোভাবেই বাঙালির হাতে শাসনভার তুলে দিতে চায়নি। ফলে এই সকল প্রকার বৈষম্যের কারণে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা:
বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্রষ্টা, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে যুক্তফ্রন্টের হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামসহ মৃত্যু অবধি অসংখ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন, বিবিসির জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির জীবনে শুভ প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর হয়েছিল। শেখ মুজিব অজস্র স্বাধীনতা সংগঠকের দীক্ষাগুরু ছিলেন, ছিলেন নয়নের মণি, আত্মার আত্মীয় ও পথ প্রদর্শক। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাকমূহূর্তে তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশেই পূর্ব পাকিস্তান পরিচালিত হতো। অসাধারণ বাগ্মি, দূরদৃষ্টি, শত্রুকে আপন করে নেওয়ার অপার মানসিকতা, রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি সুমহান স্নেহ ও অগাধ ভালবাসা ব্যক্তি শেখ মুজিবকে অনন্য উচ্চতায় স্থান দিয়েছিল। শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন: আমি হিমালয় দেখিনি তবে মুজিবকে দেখেছি। রবার্ট পেইন লিখেছেন: "পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মাঝরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানার পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। প্রতিরোধ করবার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন।" বঙ্গবন্ধুর এই আহবান ওয়্যারলেসের মাধ্যমে তাঁর সহকর্মী এবং মুক্তিকামী মানুষের কাছে পৌঁছে যায় নিমিষেই, এবং বাঙালি জাতি সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ:
বাঙালি জাতির রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষণার প্রেক্ষিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ঐদিন ভাষার দাবীতে রাজপথে নিহত হয় রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে। ভাষার দাবীতে জীবন দিতে হয়, রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির আর একটিও নেই।

ভাষা ও সংস্কৃতিতে যখন আঘাত আসে তখন বাঙালি বুঝতে পারে তাদের স্বাতন্ত্র্যকে। তারা 'বাঙালি জাতি' এই পরিচয় তাদের মধ্যে দৃঢ় হতে শুরু করে। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ সময় গঠিত হয় বেশ কিছু সংগঠন। ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, '৬২'র শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৬৬'র ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবী, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭০'র নির্বাচনে বিপুল ভোটে ১৬৭টি আসনে আওয়ামী লীগের বিজয়, এই প্রত্যেকটি ঘটনার মাধ্যমে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেই জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা:

বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগ থেকে যে চেতনা লাভ করেছে তা জাতির সকল আন্দোলনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। সমগ্র জাতি একতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, একই কাতারে মিলিত হয়েছে এ যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঐক্যবদ্ধ জাতি দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে তার পিছনে মুক্তিসংগ্রামের আত্মত্যাগ কাজ করেছে। আর সেই জাগ্রত চেতনা ছড়িয়ে গেছে বাংলাদেশের মানুষের পরবর্তী কর্মকান্ডে।

স্বাধীনতার ডাক:

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মুখে নিপীড়নকারী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' এর প্রধান আসামী শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তির পর ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যে বঙ্গবন্ধু ৬৬'তে বাঙালির ম্যাগনাকাটা ৬ দফা দাবী উত্থাপন করেছিলেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি রচনা করলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার কবিতা। স্বাধীনতায় উন্মুখ লাখো মানুষের সামনে তিনি বজ্র কণ্ঠে বলে গেলেন কাঙ্ক্ষিত সেই শব্দগুলো 'বাংলার মানুষ আজ মুক্তি চায়, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

২৫শে মার্চের কালরাত্রি:

৭০'এর নির্বাচনে বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। বরং, বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে ইয়াহিয়া খান নানা বাহানা শুরু করেন। ১৬ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত চলে মুজিব-ইয়াহিয়া প্রহসনের বৈঠক। আর ইয়াহিয়ার নির্দেশে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে থাকে অস্ত্র আর সামরিক বাহিনী। এরপর 'পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নয়-মাটি চাই' বলে হানাদার বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করে পৃথিবীর অন্যতম জঘন্য গণহত্যার হোতা ইয়াহিয়া। শুরু হয় ইতিহাসের ঘৃণিত হত্যাযজ্ঞ। যা 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে পরিচিত। ২৫ শে মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। সেই রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় তার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে। তবে তার আগেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৬ মার্চ বেলা ২টায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। ২৭ মার্চ কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ:

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে নিরীহ বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র সংগ্রামে। বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে থাকে তারা। তবে ১৯ মার্চ থেকে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর বাঙালি সৈনিক। প্রাক্তন ইপিআর, আনসার, মোজাহেদ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বীর সৈন্যরা এতে অংশ নেয়। এদের সাথে আরো যোগ দেয় যুবক ও ছাত্ররা।

মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধ:

৪ এপ্রিল, ১৯৭১ সিলেটের তেলিয়া পাড়ার চা বাগানে কর্নেল এমএজি ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়। এসময় এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩,০০০। ৯ এপ্রিল মুক্তিফৌজের নামকরণ করা হয় মুক্তিবাহিনী এবং কর্নেল এমএজি ওসমানীকে এই বাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তার নেতৃত্বে দু'টি বাহিনী গঠন করা হয় অনিয়মিত গেরিলা বাহিনী এবং নিয়মিত বাহিনী। নিয়মিত বাহিনীর অধীনে আবার ৩টি বিগ্রেড বাহিনী গঠন করা হয়- জেড ফোর্স, কে ফোর্স এবং এস ফোর্স। জেড ফোর্সের কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান, কে ফোর্সের মেজর খালেদ মোশাররফ এবং এস ফোর্সের কেএম শফিউল্লাহ। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য পুরো দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ১০ নম্বর সেক্টরটি ছিল নৌ সেক্টর। মে মাস পর্যন্ত নিয়মিত বাহিনী হিসেবে যুদ্ধ করে বীর বাঙালিরা। এরপর তারা গঠন করে একটি বিরাট গণবাহিনী 'গেরিলা বাহিনী'। জুন মাসের শেষের দিকে গেরিলারা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আগস্টে গঠিত নৌ কমান্ডো বীরত্ব ও কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। ৩ ডিসেম্বর বাঙালিদের সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে ভারতীয় সেনারা। এই যৌথ বাহিনীর যুদ্ধ চলে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

মুজিবনগর সরকার গঠন:

১০ এপ্রিল ১৯৭১ কুষ্টিয়ার বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবের পাড়া গ্রামের আম্রকাননে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। এই জায়গার নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। তাই এই সরকারকে বলা হয় মুজিবনগর সরকার। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে, রাষ্ট্রপতি শাসিত এই সরকার ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। এই দিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে তা কার্যকর হয়। পরবর্তীতে এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশ চলতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড:

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও যৌথবাহিনীর দুর্বার প্রতিরোধ ও আক্রমণের মুখে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী যখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, তখন পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে এ দেশের সূর্যসন্তানদের ওপর। আর এ কাজে তাদেরকে সাহায্য করে তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শামস্ বাহিনী। দেশের মুক্তিকামী ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারী শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ডাক্তার, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের বেশির ভাগের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে পাওয়া যায়।

পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ:

সংগ্রামী বাঙালি আর মিত্র বাহিনীর সাথে যুদ্ধে হানাদার বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে মিত্র বাহিনীর জেনারেল মানেকশ পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজীকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। ১৬ ডিসেম্বর বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অর্থাৎ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ৯৩০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন। সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করেন। এ সময় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার।

স্বাধীনতাযুদ্ধে বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালিদের পাশাপাশি বিদেশি অনেক ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যাদের ভূমিকার কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হয়। বিদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো-

ইন্দিরা গান্ধীঃ ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রর বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলেন। তার অনুরোধেই জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট প্রদান করে রাশিয়া। তিনি যুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থান গ্রহণকারী বাঙালি শরণার্থীদের ক্যাম্প পরির্দশন করেন। এসময় তিনি প্রায় এক কোটি শরণার্থীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আঁদ্রে মার্লোঃ আঁদ্রে মার্লো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে অবস্থানগ্রহণকারী বিশ্ব ব্যক্তিত্ব। তিনি ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেলে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জোরালো সমর্থন গড়ে ওঠে।

জর্জ হ্যারিসনঃ আমেরিকান পপ সংগীত তারকা জর্জ হ্যারিসন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ভারতের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী পন্ডিত রবি শংকরের অনুরোধে একটি কনসার্ট করতে রাজি হন। হ্যারিসনের ব্যান্ড পার্টি ব্রিটলস ১৯৭১ সালে নিউইয়র্কের ম্যাসিন স্কয়ারে "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" নামে একটি কনসার্টের আয়োজন করেন। হ্যারিসনের ইচ্ছায় বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের নিমর্ম হত্যাযজ্ঞের স্থির চিত্র প্রদর্শিত হয়। ফলে বাংলাদেশে পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। হ্যারিসনের আন্তরিক চেষ্টার ফলে উক্ত কনসার্ট থেকে প্রায় আড়াই লাখ ডলার অনুদান সংগৃহিত হয়। যার সবটাই বাংলাদেশে নিপীড়নের শিকার মানুষের জন্য প্রদান করা হয়।

জোয়ান বায়েজঃ বিখ্যাত সংগীত তারকা জোয়ান বায়েজ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে গান রচনা করেন। যার শিরোনাম ছিল "বাংলাদেশ বাংলাদেশ"। তার মতো একজন বিশ্বখ্যাত তারকার বাংলাদেশ নিয়ে গান রচনা করায় বাংলাদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে বিদেশিদের টনক নড়ে।

সাইমন ড্রিঃ সাইমন ড্রিং বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের গণহত্যার খবর প্রথম বর্হিবিশ্বে প্রচার করেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিশ্ব দরবারে পাকিস্তানিদের গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন।

উথান্টঃ স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব মিয়ানমারের নাগরিক উথান্টও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের গণহত্যার বিষয়ে ইয়াহিয়া খানের কাছে উদ্বেগ জানান। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারতে আশ্রয়রত বাঙালি শরণার্থীদের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্য আসে।

শ্রী-কুদরিয়া ভেৎসেবঃ ভারত সফররত সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রী কুদরিয়া ভেৎসেবের বলিষ্ঠ ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশকে সাহায্য করতে গিয়ে ভারত আক্রান্ত হলে রাশিয়া ভারতের পাশে দাঁড়াবে।

ডব্লিউ এস. ওডারল্যান্ডঃ ন্যাদারল্যান্ডস এর বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলীয় নাগরিক ডব্লিউ এস. ওডারল্যান্ড বাংলাদেশের বাটা কোম্পানির কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি ২য় বিশ্বযুদ্ধের একজন যোদ্ধা ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেন।

এ্যান্থনি মাসকারেনহাসঃ ব্রিটিশ সাংবাদিক এ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে সংবাদ ছাপানোর জন্য। তিনি তা না করে বিবেকের তাড়নায় বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিদের গণহত্যার চিত্র বিদেশি পত্রিকায় তুলে ধরেন। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর গণহত্যা নিয়ে তার রচিত বই 'রেইপ অব বাংলাদেশ' এবং 'লিগ্যাসি অব ব্লাড'।

সিডনি স্যান্ডবার্গঃ নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক সিডনি স্যান্ডবার্গ পাকিস্তানি শাসকদের অপকীর্তি নিয়ে রিপোর্ট ছাপান। একারণে তাকে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করে।

এডওয়ার্ড এফ. কেনেডিঃ তিনি মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্রেট দলীয় সদস্য। ১৯৭১ সালে তিনি আমেরিকার পাকিস্তানঘেষা পররাষ্ট্রনীতির বড় সমালোচক ছিলেন।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোনি এবং প্রধানমন্ত্রী অ্যালেগ্রেই কেসিগিনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বিদেশি রাষ্ট্রের ভূমিকাঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশি রাষ্ট্র ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারত বাংলাদেশকে সামরিক শক্তি, শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান এবং বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে। যুদ্ধের শেষের দিকে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযাদ্ধাদেরকে নিয়ে মিত্রবাহিনী গড়ে তোলে। যা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ভারতের পর সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের। সোভিয়েত রাশিয়া জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্বাধীনতার বিপক্ষে উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপক্ষে ভেটো দেয় এবং বাংলাদেশে ভারতের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ করে। যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর নিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করতে এলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ষষ্ঠ নৌবহর পাঠায়। ফলে মার্কিন নৌবহর ফিরে যেতে বাধ্য হয়। দুটি দেশ ছাড়াও আরো যে কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল সেগুলো হলো- যুগোস্লাভিয়া, জার্মানি, ভেনিজুয়েলা, ফ্রান্স, সুইডেন, আর্জেন্টিনা, সেনেগাল, পোল্যান্ড, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, কিউবা প্রভৃতি। উক্ত দেশগুলো স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সুসংহত করে।

চূড়ান্ত বিজয়:

ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত সংগ্রামে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এর ফলে পাক বাহিনী নাজেহাল হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪টা ৩১ মিনিটে ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের সেনা প্রধান নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব:

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের কাহিনী আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। ভারত সে সময় ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিয়ে বিশ্বজনমত তৈরিতে এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে এসে এসময় ভারতও সশস্ত্র যুদ্ধে নামে। সোভিয়েত ইউনিয়নও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দেয়। তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের বিরোধিতা করলেও সে দেশের জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। তাদের প্রতিরোধের মুখে মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিটলস এর জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় পন্ডিত রবি শংকর 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এর আয়োজন করেছিলেন। ফরাসি সাহিত্যিক আন্দ্রে মারোয়া, জ্যা পল সাত্রে সহ অনেকেই বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

উপসংহার:

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা বরাবরই অনেক কঠিন কাজ। লক্ষ্যপ্রাণ আর রক্তগঙ্গার বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এর মাধ্যমে অবসান হয়েছিল দীর্ঘ ২৪ বছরের শোষণ ও নিপীড়নের। কিন্তু স্বাধীনতার ৪০ বছর পার হয়ে গেলেও এখনো আমরা গড়তে পারিনি আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। স্বাধীন হয়েও স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ আমরা উপভোগ করতে পারিনা। আমাদের যেমন সংকট আছে, তেমনি সম্ভাবনাও আছে। সব সংকটকে দূরে সরিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। নিজের কর্তব্যবোধ, দেশপ্রেম আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেই আমরা রক্ষা করতে পারব আমাদের স্বাধীনতাকে।

চেতনায় স্বাধীনতা

সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রধান হিসাবরক্ষক

শাসক গোষ্ঠী পাকিস্তানের
ভিত্তি কাঁপানো সূর।
কেড়ে নেবে মায়ের ভাষা
যা হৃদয়ে সুমধুর।
গর্জে উঠে বীর বাঙালি
বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।
বুকের রক্তে ভাঙলো কারফিউ
মায়ের ভাষা রক্ষার্থে।
নানান রকম বৈষম্য
এই বাংলার সঙ্গে।
ঘুরে দাঁড়ালো বাঙালিরা
স্বাধীনতার মন্ত্রে।।
ছেষট্টির ছয়দফা-
অধিকার আদায়ের দাবী।।
উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান
মামলা--ষড়যন্ত্রী।।
বজ্রকণ্ঠে জাতির পিতার
স্বাধীনতার ঘোষণা।।

উত্তাল মার্চে বন্দি মুজিব
মুক্তির নতুন প্রেরণা।
মার্চের কালরাত্রিতে
হানাদারের নগ্ন হানা।
নিরস্ত্র অসহায় বাঙালি
জাগ্রত দেশপ্রেমের চেতনা।
নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-
বিনিময় ত্রিশ লক্ষ প্রাণ
সম্ভম গেল দুই লক্ষের
ঘৃণিত ছিল কি সেই অপমান!
জীবন গেল লক্ষ লক্ষ
আশ্রয় হারা কোটি সহস্র
এই অজস্র ত্যাগে—
যুদ্ধ শেষে বিজয়রথে
মিলল মুক্তির বারতা
আমরা পেলাম কাঙ্খিত
সেই স্বপ্নের স্বাধীনতা।।

“তাঁতের কাপড় পরিধান করুন
দেশের টাকা দেশে রাখুন”

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
www.bhb.gov.bd